৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

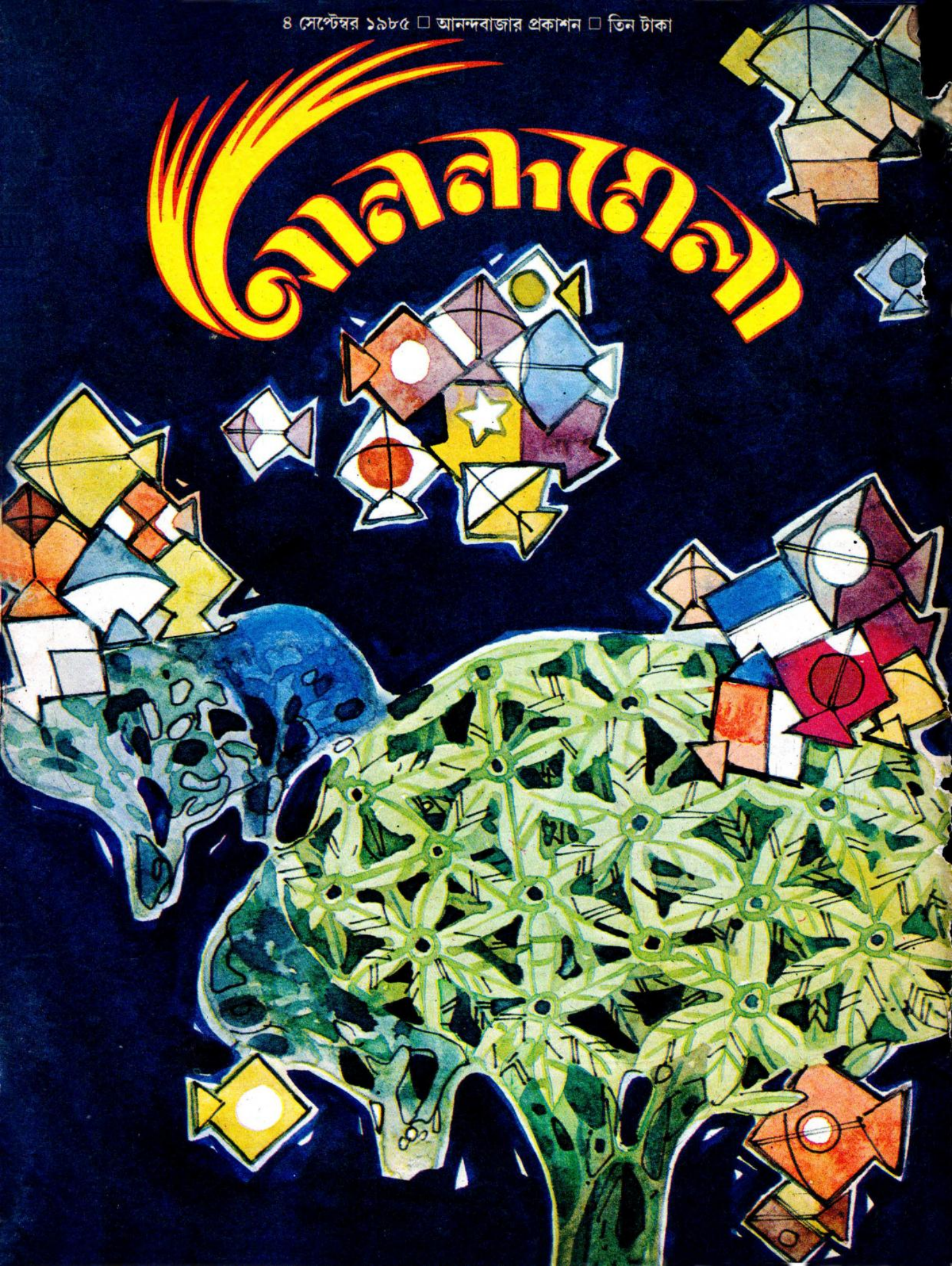

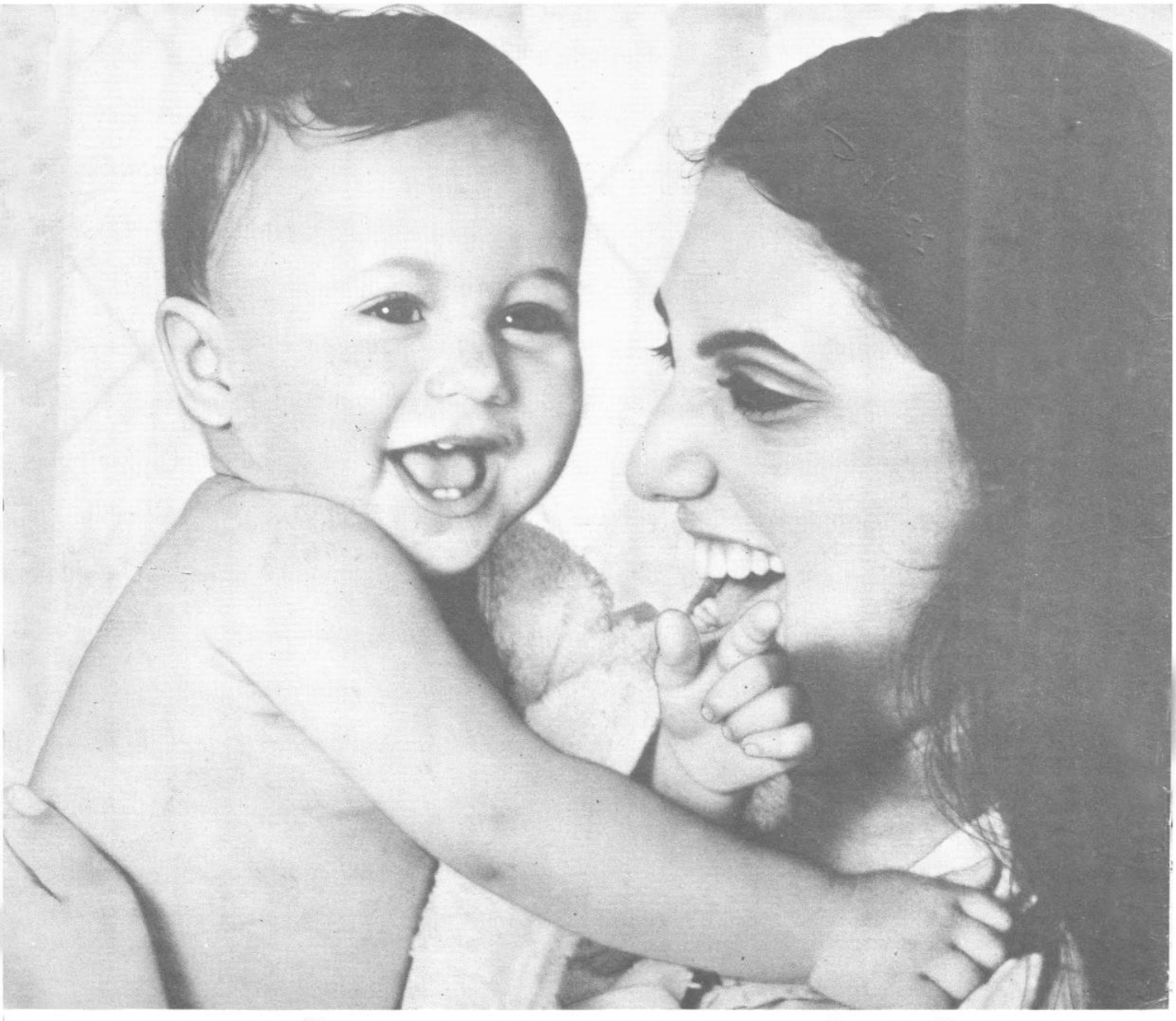

আপনার সোনাটির কোমল ত্বকে আপনার স্নেহ-মধুর চুম্বনের মতই দেয় এ এঁকে!

জনসন্স বেবী সোপ, ছোট্ট সোনাদের ছোট্ট দুনিয়ার নানান 'স্পেশাল' জিনিষের মধ্যে এটিরও একটি স্থান রয়েছে।

জনসন্স বেবী সোপ-এ ল্যানোলিন মেশানো থাকে ব'লে, এর পরশটি হয়ে ওঠে মায়ের মমতাভরা মৃদু-কোমল পরশের মতই! আর, এর কোমল-মধুর সুবাস, সারা অঙ্গে ঘিরে থেকে, সোনাটিকে মাতিয়ে রাখে শিশুসুলভ আনন্দের ধারায়!

জনসন্স বেবী সোপ
বিশুদ্ধ...মৃদু...নিরাপদ

Johnson & Johnson

© J&J

OBM/2103-BEN

আনন্দমেলা

১৯ ভাদ্র ১৩৯২ । ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ । ১১ বর্ষ ১১ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
আমহার্স্ট স্ট্রিটে অ্যাডভেঞ্চার । বাসুকি বর্মা ৩৫
অরণ্যের গল্প
সুন্দরবনের বাঘ । অর্ধেন্দু দত্ত ৫
গল্প
ফালাকাটা বাংলোর রাত্রি । দেবল দেববর্মা ১৩
ঠোঁট-কাটা চড়ুই । নন্দলাল পাল ২৫
বিশেষ রচনা
গুজরাতের ঘুড়ির মেলায় । সত্যপ্রিয় সরকার ৯
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২৯
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫১
শার্লক হোমসের গল্প
বুড়ো আঙুলের কথা । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৬
ছড়া ও কবিতা
রাজা-রানি । রত্নেশ্বর হাজরা ৮
বাপ্পার জন্যে । দেবব্রত ভৌমিক ৮
বিজ্ঞানবিচিত্রা
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ১৯
এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৩
লেখাপড়া
মট্‌কি···তিজেল (অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৩২
বাবা হাসপাতালে (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৩২
খেলাধুলো
ভারতের হার, জয় বিজয়ের । অশোক রায় ৬২
অস্ট্রেলিয়াকে বাঁচাল বর্ডারের ব্যাট । রাজা গুপ্ত ৬৩
হাউজ দ্যাট । সুজয় সোম ৬৫
ছাই নিয়ে লড়াই । সুব্রত সিংহ ৬৬
ডাক্তারবাবু বলছেন
বর্ষাকালের খাওয়া-দাওয়া । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ১৯
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২১, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৪, শব্দসন্ধান ৫৪
মজার খেলা ৫৫, হাসিখুশি ৫৫

প্রচ্ছদ : সমীর মণ্ডল

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি ● জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক
বাংলাদেশে আইনসম্মতভাবে বিক্রির জন্য প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার আবশ্যক ।
যোগাযোগ কেন্দ্র :
কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭

সগৌরব অবদান

গ্লুকন-ডি®

সুপারহিরো

মায়ের গর্বের সুপারহিরো !

এই নতুন আসল প্যাকটি দেখে নিন।

গ্লুকন-ডি সুপারহিরো আসা মানে তো আপনার আদরের বাচ্চার জন্যে যেটি মনে-প্রাণে চান, তার সবকিছুই তো এতে পান—চঞ্চল, দুরন্ত, প্রাণপ্রাচুর্য অফুরন্ত, যার তুলনা কোথাও মেলে না !

আপনার বাচ্চাকে দিন এমন দারুণ পানীয়, যা সুপারহিরোর অতি প্রিয়—গ্লুকন-ডি।

গ্লুকন-ডি-তে আছে গ্লুকোজ, ভিটামিন-ডি আর ক্যালসিয়াম ফসফেট, যা আপনার আমাদের বাচ্চাকে নিমেষে শক্তি যোগাবে আর সেও কি পড়াশুনায়, কি খেলাধুলায় সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।

তাহলে এখন, আপনার চোখের সামনে আপনারই আদরের সুপারহিরো দুরন্ত, চঞ্চল···গ্ল্যাক্সোর গ্লুকন-ডি'র দৌলতে প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল।

গ্লুকন-ডি®

নিমেষে শক্তি যোগানের পানীয় সুপারহিরোর অতি প্রিয়

GLL 1842

হামাগুড়ি দিয়ে বাঘটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে...

সুন্দরবনের বাঘ

অর্ধেন্দু দত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জিম করবেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ আমার ঘটেছিল। কারণ, সে-সময় আমি লাহোরে সেনাবিভাগে কর্মে নিযুক্ত।

একদিন করবেট বললেন, "আসাম ও দক্ষিণ ভারতের বনাঞ্চল তো দেখলে, সুন্দরবনের বাঘের অভিজ্ঞতা আছে? না থাকলে একবার ঘুরে এসো।"

প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগের ঘটনা।

অফিসের কাজে সেবার আমি ও মেজর বোল্‌ট্‌ খুলনার একটি গ্রামে এসেছি।

জরিপের কাজে তখন সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁবু পড়েছে। মিঃ বসু ও শর্মার সঙ্গে পরিচয় হয়। ভাবলাম এই সুযোগে সুন্দরবন অঞ্চলটা ঘোরা যাক। মেজর বোল্‌ট্‌কে বলে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে ওঁদের দলে ভিড়ে পড়ি।

সারাদিন ওঁরা জরিপের কাজে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে জোর আড্ডা বসে। তাস, গল্প, সিনেমার কাহিনী, সাহিত্যের আলোচনা কত কী!

এক-একদিন ওঁদের মুখে শিকারের গল্প শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে যাই। শ্রোতা হিসাবে পাশের গ্রামের দু-একজন তরুণও উপস্থিত থাকেন। জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে বসু ও শর্মার বন্যপ্রাণীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রচুর। অভিজ্ঞ শিকারিও বটে।

বসু আমাকে বললেন, "শিকারিদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে শিকারের অভিজ্ঞতা আপনারও কোনও অংশে কম নয়।"

বসু বিভিন্ন বনাঞ্চলে এ-পর্যন্ত আটটি বাঘ নিধন করেছেন, আর শর্মা তো ব্যাঘ্রচর্মে বসে সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন।

জরিপের শ্রমিকের সংখ্যা পনেরো। তার ওপর ঠাকুর-চাকর তো রয়েছে।

সেদিন ছিল শনিবারের সন্ধ্যা। পরদিন রবিবার। ছুটির আমেজ। কাজেই রাত্রে মুর্গি সহযোগে ডিনারের ব্যবস্থা।

ঠিক হয় মুর্গির জন্য পাশের গ্রামে হরিধনকে পাঠানো হবে, আর কিছু আনাজ-তরকারিও কিনে আনবে।

বিকেল তিনটায় হরিধন থলে হাতে পাশের গ্রামে রওনা হয়।

মনে প্রচুর আনন্দ নিয়ে তাঁবুতে বসে আমরা চারজনে তাস খেলছি। কিন্তু আমাদের উল্লাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

সন্ধ্যার মুখে এই গ্রামের দুজন লোক ছুটতে-ছুটতে এসে খবর দেয় যে, ওরা দুজন ও হরিধন একসঙ্গে আসছিল। একটু আগু-পিছু হতেই হরিধনকে আর দেখতে পায় না। একটা বোট্‌কা গন্ধও নাকে ভেসে আসে। মনে হয় হরিধনকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

বসু বললেন, "জীবনে অনেক হিংস্র জন্তু নিয়ে কারবার করেছি। সন্ধ্যার মুখে পাশাপাশি তিনজনের মাঝখান থেকে বাঘ মানুষ ধরে খাবে, এ-কথা অবিশ্বাস্য।"

লোক দুজনকে আশ্বাস দিয়ে বসু বললেন, "সে নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছে। দ্যাখো গিয়ে, এতক্ষণে এসে পড়েছে।"

সন্ধ্যা সাতটার পর যখন হরি ফিরে এল না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এত রাতে সন্ধান করা বিপজ্জনক তো বটেই, উপরন্তু গ্রামের লোকদের একত্রে জড় করা শক্ত।

সে রাত্রে আমরা কেউই ভাল ঘুমোতে পারিনি। অন্য শ্রমিকদের মনে ভয় ধরে যাওয়াটা মোটেই ভাল নয়।

পরদিন ভোরে ওদের অভয় দিয়ে বসু, শর্মা ও আমি হরিধনের সন্ধানে যাই।

তিনজনে দুটি রাইফেল কাঁধে নিয়ে রওনা হই। ধরে নিই, হরিধনকে বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে নদী ও খাড়ির সংখ্যা অজস্র। সে-ক্ষেত্রে তাকে নদীর কাছাকাছি কোনও স্থানে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এই রকম অনুমান করে আমরা নদীর দিকেই রওনা হই।

বন অত্যন্ত নিবিড়—সুন্দরী গাছ, জারুল, হিজল ও বন্য লতার ঘন পাতায় রৌদ্র ও আলোকের পথ প্রায় রুদ্ধ। বহু কষ্টে কাঁটা গুল্ম, শুষ্ক পত্র ও ভাঙা ডালপালা সরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর আমাদের দেহ মন উভয়ই ক্লান্ত। হঠাৎ সামনের ঝোপের পাশে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পাই। ছাপ দেখে মনে হয়, বাঘটা প্রকাণ্ড। আশেপাশে চাপ-চাপ রক্ত। একটু দুর্গন্ধও নাকে ভেসে আসে।

বনের মধ্যে একটি স্থান ডোবার মতো দেখতে, বর্ষার জল তাতে সঞ্চিত হয়েছে। রৌদ্র, আলো, বাতাস প্রবেশ করতে না পেরে শুকনো পাতা পচে দুর্গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দেখি ডোবার ডান দিকে ঝোপের গা ঘেঁষে অর্ধ-ভুক্ত নরদেহ। পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

বসু চুপিচুপি বললেন, "এই তো হরিধনের ডোরাকাটা ফতুয়া।"

কোমর হতে দেহের নীচের অংশ লতাপাতা ও ডালপালায় ঢাকা। পাছে শকুন, শেয়াল প্রভৃতি প্রাণীরা বাকি অংশটুকু খেয়ে ফেলে বলে বাঘের এই সতর্ক ব্যবস্থা।

সন্তর্পণে বসু, শর্মা ও আমি অর্ধভুক্ত দেহটার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠি। সেই ভীষণ দৃশ্য আমি জীবনে কখনও বিস্মৃত হতে পারব না। চোখদুটি নিষ্পলক, একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ভাব যেন তখনও চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে।

সাবধানে গুঁড়ি মেরে ঝোপের ভেতর চেয়ে দেখি, বাঘের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে-সেখানে টুকরো-টুকরো বিক্ষিপ্ত মাংস। আমরা ঠিক করেছিলাম তিনজনে ধরাধরি করে অবশিষ্ট দেহটা তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, তা সম্ভব নয়। কারণ তাঁবু এখান হতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। অথচ হরিধনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তাঁবুর খুব কাছ থেকেই। উপরন্তু অর্ধ-ভুক্ত দেহটা তাঁবুতে নিয়ে গেলে শ্রমিকরাও ভয় পাবে।

ব্যথিত হৃদয়ে দুপুরের আগেই তাঁবুতে ফিরে আসি। আমাদের সৌভাগ্য যে, পথে কোন প্রকার বিপদ ঘটেনি।

পাঁচ মাইল দূরে আজ যখন নরখাদক বাঘের আস্তানা স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তখন তাঁবুর আশেপাশে বাঘের আগমন একেবারে অসম্ভব নয়।

সন্ধ্যার পর মিঃ বসু সব শ্রমিকদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, তাঁবুর চারপাশে যেন আগুন জ্বেলে রাখা হয়। আর চৌকিদার দু'জন রাইফেলসহ সজাগ দৃষ্টিতে যেন পাহারা দেয়।

চৌকিদার দু'জন সমস্বরে বলে : দেড় মাহিনা হুয়া, আভিতক্ একঠোও শের্ নাহি দেখা।

আশ্চর্য! সেই রাত্রেই বাঘ এল।

সবাই আমরা তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। পাশের তাঁবুগুলো হতে নাক ডাকার শব্দ কানে ভেসে আসে। মশা মারার চড়-চাপড়ও দু-একটা শোনা যায়।

হঠাৎ সমবেত আর্তনাদ! তাঁবু থেকে শ্রমিকরা চিৎকার করে বলে : বাঘ, বাঘ! নরেনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

নরেন ছিল আমাদের রাঁধুনি। রান্নাঘরের পাশের তাঁবুতেই বাঘ ঢোকে।

মিঃ বসু, শর্মা ও আমি একটি তাঁবুতে শুয়ে আছি। বাঘ যে আসবে তা আমি জানতাম। কারণ এরকম ঘটনা আমি পূর্বে আরও প্রত্যক্ষ করেছি।

বসু আমাকে হ্যারিকেন ধরতে বলে রাইফেল হাতে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি ও শর্মা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই।

প্রত্যেকের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে বসু, শর্মা ও আমি যে পথে বাঘ নরেনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, সে পথে রওনা হই। দুজনের হাতে দুটি রাইফেল। আমার হাতে পাঁচ ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চ। বসুর হাতেও একটা।

হৈ-হল্লার মধ্যে বাঘ বোধহয় এখনও বেশি দূর যেতে পারেনি। উপরন্তু নরেনের বিশাল দেহকে টেনে নিয়ে যাওয়া বাঘের পক্ষে একটু কষ্টদায়ক! নরেনকে জীবিত পাওয়া অসম্ভব নয়।

আমাদের অনুমানই ঠিক।

কিছু দূর এগোতেই একটি ঝোপের আড়ালে গোঙানির আওয়াজ পাই। গিয়ে দেখি নরেন। তাঁবু থেকে তার দূরত্ব একশো গজের মধ্যে।

নরেন ছিল খুব শক্তিশালী। ওকে যখন বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তখন নরেন বাঘের সঙ্গে লড়েছিল, তার প্রমাণও আমরা পেয়ে যাই। একটি মোটা কাপড়ের জামাও তার গায়ে ছিল। ফলে তার পিঠের ক্ষত খুব গভীর হয়নি।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভোরে শহরের হাসপাতালে নরেনকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়ি। এভাবে অদৃশ্য শত্রুর পেছনে ধাওয়া করা যুক্তিসঙ্গত কি না ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। তবুও আমরা নালার ধার দিয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে চলি।

প্রায় কয়েক ঘণ্টা জঙ্গলে ঘুরেও বাঘের কোনও খোঁজ পাইনি।

তাঁবুতে ফিরে আসি।

তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করি, তিন-চার দিন অপেক্ষা করে দুপুরের দিকে কতকগুলো গোরু, ছাগল জঙ্গলে ছেড়ে

দেওয়া হবে। আর আমরা তিনজন ঝোপঝাড়ওয়ালা গাছে বসে লক্ষ রাখব।

তিন-চার দিন খুব সাবধানে প্রায় না ঘুমিয়েই তাঁবুতে কাটাই, শ্রমিকদেরও সাবধান করে দিই।

তিন-চার দিন অপেক্ষা করার কারণ পাঁচদিন আগে বাঘ হরিধনের মাংস খেয়েছে। একটু ক্ষুধার্ত না হলে বাঘ কি আবার আহারের সন্ধানে বের হবে? উপরন্তু, বাঘ বুঝে গিয়েছে যে আমরা খুব সাবধান হয়ে গিয়েছি। দ্বিতীয় কারণ একটি বাঘ এক রাখাল বালকের ছাগলকে দিন কয়েক আগে তাঁবুর নিকটবর্তী খাড়ির মুখে ধরার চেষ্টা করে। রাখাল বালকের চিৎকারে মধুসংগ্রহকারী জনা-দশেক লোক উপস্থিত হওয়ায় বাঘটি চম্পট দেয়। বাঘটি দেখতে নাকি বিরাট।

চম্পট দেওয়ার কারণ বাঘের বিশেষ খিদে ছিল না। আর নরেনকে ধরার কারণ বাঘটি মানুষখেকো বলে।

নির্দিষ্ট দিনে প্ল্যান অনুযায়ী কতকগুলি গোরু ও ছাগল খাড়ির মুখে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। গোরু ও ছাগলগুলি প্রথমে ভয়ে জঙ্গলে ঢুকতে চায়নি। কোথাও একটা মচমচ আওয়াজ অথবা পাখির নড়াচড়ার শব্দে লেজ গুটিয়ে গ্রামের দিকে দৌড় দিচ্ছিল। অনেক কষ্টে আবার তাদের জঙ্গলের মধ্যে একটা সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমরা তিনজন তখন দুটি ঝোপঝাড়ওয়ালা গাছে আত্মগোপন করে বসে আছি। আমার গাছে ছিলেন মিঃ বসু। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিকারি। শর্মা ছিলেন আর একটি গাছে।

গোরু ও ছাগলগুলি রুচি ঘাসপাতা খাচ্ছিল। সূর্যের তেজ ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। বেলা প্রায় চারটের কাছাকাছি। আমরা যেখানে বসে আছি তার ডান দিকে নালার এপারে ঝোপঝাড়ওয়ালা কাঁটা গাছ ও নলখাগড়ার বন। হঠাৎ যেন কাঁটা ঝোপের বনটা নড়ে ওঠে। বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মাটিতে পাথরের টুকরো খসে পড়ার শব্দও কানে আসে। হামাগুড়ি দিয়ে বাঘটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। সামনের বলিষ্ঠ বলদের দিকেই তার লক্ষ। এবার বাঘের মাথাটা দেখতে পাই।

বসুও নড়েচড়ে ওঠেন। বাঘটি যেই লাফ দিতে যাবে অমনি বসুর রাইফেল গর্জে ওঠে। নিখুঁত লক্ষ্য—একেবারে পাকা শিকারির মতো।

গুলি খেয়ে বাঘটি বিকট গর্জন করে পাশের ঝোপে এলিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গুলি আর খরচ করতে হয়নি।

বাঘের গর্জন আর রাইফেলের গুলির শব্দে গোরু ও ছাগলগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্রামের দিকে পালায়। ভীত, সন্ত্রস্ত, প্রাণে বাঁচার আশায় প্রাণীগুলির দৌড়নোর দৃশ্য দেখে মনে করুণা জাগে!

কয়েক মিনিট পরে আমরা গাছ থেকে নেমে আসি। বসুকে বলি, "এটা যে সেই নরখাদক বাঘ, তার কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই। অন্য বাঘও হতে পারে।"

বসু বলেন, "কথাটা অতি সত্যি।"

এর পর আমি আরও দিন-সাতেক ওই অঞ্চলে ছিলাম। কিন্তু কোনও বাঘের উপদ্রবের সংবাদ পাইনি।

বাঘটি ছিল দশ ফুট আট ইঞ্চি।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

রাজা-রানি

রত্নেশ্বর হাজরা

সূর্যগড়ের চন্দ্রমানিক রাজা
দুষ্টকে দেয় ভীষণরকম সাজা
ধরে ডাকাতটাকে
বলে, আমার ঢাকে
আমার নামের জয়ধ্বনি বাজা ।

ঢাকের বাজনা শুনে তোত্‌লা রানি
কুঁজির সঙ্গে করল কানাকানি,
বলল, রাজামশাই এবার
আমার জন্মদিনে
দিতে হবে আড়াইশো জামদানি ।

রানির কথা রাজা-ই শুধু বোঝে
জামদানিদের খোঁজে
আড়াই লক্ষ লোক পাঠাল
জামের বনে-বনে ।
ঘুরল সবাই এদিক-ওদিক,
সকল দিকের কোণে
জম্বুদ্বীপে দিশি জামের বনে ।
কিন্তু সবাই বিফল হয়ে
ফিরল যখন ঘরে
ভীষণ ভয়ে রাজা
বলল, ওরে এবার
রানির নামেই জয়ধ্বনি বাজা ।

বাপ্‌পার জন্যে

দেবব্রত ভৌমিক

লুকোচুরি খেলতে তুমি বাসতে বড় ভাল
বাবার সাথে করতে কত খেলা,
ভোরের বেলা আকাশ জুড়ে যেই ফুটত আলো
ছুটির দিনে কিংবা দুপুরবেলা—
পড়ার ঘরে ডাকাত হয়ে যখন দিতে হানা,
করতে শুরু প্রবল টানাটানি,
শুনতে নাকো নিষেধ কারও, মানতে নাকো মানা ।
"বাবা তোমার কাজ আছে তা জানি,
এখন তুমি খেলবে এসো, পোড়ো বিকেলবেলা,
ছেলেমেয়ে যাক না ফিরে বাড়ি ।"
বলতে তুমি, "খেলবে এসো লুকোচুরির খেলা,
নইলে বাবা, তোমার সঙ্গে আড়ি ।"
কখন যেন পিছন ফিরে দু'হাতে চোখ বুজে,
বলতে, "টুকি, পারো আমায় ছুঁতে ?"
বাবা যখন পেত তোমায় খাটের কোণে খুঁজে
তুমি তখন ভীষণ অবাক হতে ।
আজকে, বাবা, পালা এল আমার অবাক হবার,
বাপ্‌পা তুমি লুকিয়ে গেলে কোথায় !
আকাশ-বাতাস বিশ্বভুবন খুঁজে না পাই আর,
ডাকি কেবল, "বাবা, আমার আয় !"
দাও না সাড়া, শূন্য বাড়ি, শূন্য আমার সব,
সত্যি আমার অবাক হবার পালা,
কোথায় গেল বাগান জুড়ে পাখির কলরব,
শুকিয়ে গেল তাজা ফুলের মালা ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ঘুড়ি, লাটাই—দুয়েতেই চলে রঙের প্রতিযোগিতা

গুজরাতের ঘুড়ির মেলায়

সত্যপ্রিয় সরকার

আর-ক'দিন বাদেই বিশ্বকর্মা পুজো। তোমাদের চোখে ঘুম নেই। নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে গেছ। হৈচৈ আর হুটোপুটিতে পাড়া একেবারে সরগরম। বাড়ির ছাদ, সামনের ফাঁকা মাঠ, বাড়ির পিছনের বড় রাস্তা, পাশের ঘাসমুড়োনো একচিলতে জমি—কোথাও খালি নেই। সব এখন তোমাদের দখলে। একটু বাদেই কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠবে, পটকা ফাটবে দুড়ুম-দাড়ুম। লাল-সবুজ-হলদে-বেগুনি হরেক রঙে আকাশ ভরে যাবে। 'ভো-কাট্টা' ভো-কাট্টা' শব্দে পাড়া মাথায় তুলবে তোমরা। বাস্ রে, কী আনন্দ। আমি কিন্তু একটুও বানিয়ে বলছি না। ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দ আর মজা তো এইরকমই। সত্যি কি না বলো!

যাকে নিয়ে এত শোরগোল, সেই ঘুড়ির জন্ম কিন্তু আমাদের দেশে নয়। চিনদেশে। প্রায় চার হাজার বছর আগে। সেই সময় ঘুড়ির চেহারাও ছিল অন্যরকম। এতকাল বাদেও, এখনও চিনে তো বটেই, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি পৃথিবীর নানা দেশে ঘুড়ি ওড়ানোর চল আছে। ঘুড়ি নিয়ে মজা আর আনন্দও কম হয় না। অনেক দরকারি কাজেও ঘুড়িকে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন যে এই ঘুড়ির সাহায্যেই প্রথম আকাশ থেকে মেঘ আর বিদ্যুতের নানান খবর যোগাড় করেছিলেন, সে তো তোমরা জানোই!

আমাদের দেশেও ঘুড়ি ওড়ানো হচ্ছে নেহাত কম দিন

বাবা ছেলে, দুজনেই ঘুড়ির মেলায়

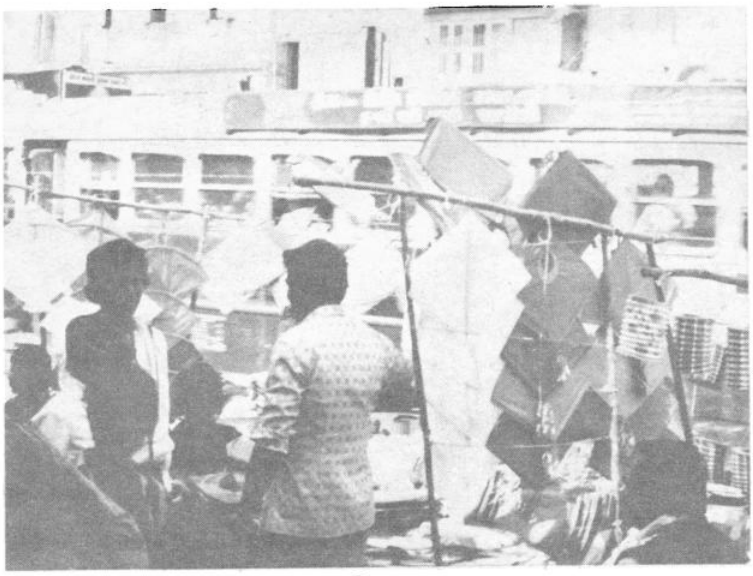

ব্যস্ত রাস্তার ধারে ঘুড়ির মেলা

রংওয়ালারা ব্যস্ত রাস্তার ধারে

ঘুড়ি ওড়ানো ছেড়ে বিক্রির আসরে

নয়। সেই শাহ আলমের রাজত্বকাল থেকে। এত বছর পরেও ঘুড়ি ওড়ানোর আনন্দে এতটুকু চিড় ধরেনি। ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই ঘুড়ি ওড়ানো হয়। কোথাও-কোথাও শুধু ঘুড়ি নিয়ে ছোটখাটো মেলাও বসে যায়। এরকম এক সুন্দর ঘুড়ির মেলায় আমরা সত্যি-সত্যি একদিন হাজির হয়েছিলাম। সে-কথাই বলছি, শোনো।

'কাইট ফ্লাইং ইন সেফ্‌টি'—আমেদাবাদের রাস্তায় কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তাকিয়ে দেখি একজন লোক হাতে ছোট্ট একটা বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই বাক্সে হরেক জিনিস, মোটা কাগজের ছোট-ছোট গাম-টেপ, রবারের ছোট ঠুলি, আরও কত কী! ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ধারালো সুতোয় যাতে আঙুল কেটেছড়ে না যায়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। ঘুড়ি ওড়াবার জন্যে এইসব আয়োজন দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, গুজরাতের ছেলেমেয়েদের কাছে ঘুড়ি ওড়ানোটা কত প্রিয়। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েরাও ওখানে ঘুড়ি ওড়ায়। হৈচৈ করে।

গুজরাতে ঘুড়ি ওড়ানোটা অনেকটাই ধর্মীয় ব্যাপার। দুর্গাপুজোর সময় আমরা যেমন নতুন জামা-জুতো পরে আনন্দ করি, তেমনই গুজরাতে 'উত্তরণ'-এর দিন ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করে। উত্তরণ গুজরাতের খুব বড় উৎসব। পৌষসংক্রান্তির দিন থেকে এই উত্তরণ (ওইদিন থেকে সূর্য তার গতিপথ পরিবর্তন করে ক্রমশ উত্তর দিকে সরতে থাকে। একে 'উত্তরায়ণ' বলে। এর থেকেই হয়েছে 'উত্তরণ'।) শুরু হয়। শহরে গ্রামেগঞ্জে খুশির হাট বসে যায়। মন্দিরে গিয়ে সবাই আরাধ্য দেব-দেবীর পুজো দেয়। ঘরে-ঘরে তৈরি হয় দুধপাক, শ্রীখন্ড ইত্যাদি হরেক মিষ্টি। উৎসবের সাজে সেজে ওঠে সারা গুজরাত। যেদিকেই তাকানো যায় শুধু রং আর রং।

গুজরাতে ঘোরবার সময় প্রায়ই চোখে পড়ত ছেলেমেয়েরা মহা আনন্দে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। গ্রামের পথে মেয়েদের ঘুড়ি নিয়ে মাতামাতি দেখে ভারী মজা লাগত। আমেদাবাদ শহরে ঘুড়ির বাহার দেখে অবাক হতে হল।

সুন্দর শহর আমেদাবাদ। সবরমতী নদীর পশ্চিম পারে পুরনো শহর। পুব পারে গড়ে উঠেছে নতুন শহর। রাজধানী সেখান থেকে সরিয়ে গান্ধীনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু এতে শহরের গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। মাঝে-মাঝেই তৈরি করা হয়েছে গান্ধীজি, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেলের নামে সেতু, এবং এই সব সেতু দিয়েই দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। বহু পুরনো ব্রিজও আছে, যার নাম এলিস ব্রিজ। আর আছে এক কাঠের সেতু, যা পাকা করবার জন্য গান্ধীজি আন্দোলন করেছিলেন।

অন্যান্য পুরনো শহরের মতো আমেদাবাদও এক সময় ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। জায়গায়-জায়গায় ছিল ফটক, সেখান দিয়েই যাতায়াত করা যেত। এখনও তার পরিচয় মেলে লাল দরওয়াজা, ত্রান দরওয়াজা, দিল্লি দরওয়াজা ইত্যাদি জায়গার নামে। কোথাও কোথাও সেরকম দরওয়াজা এখনও রয়ে গেছে। যেমন ত্রান দরওয়াজা। রাস্তা জুড়ে বিশাল পাথরের ফটক। গুজরাতি ভাষায় ত্রান মানে তিন। মাঝখানে বড়, আর দুপাশে ছোট—মোট তিনটে দরজা ভেদ করে চলে গেছে

শহরের ব্যস্ত রাস্তা। বাজার-এলাকা বেশ জমজমাট। সব্জিমন্ডি, মানিকচক, রানিকি হাজিরা, সব পাইকারি বাজারের লাগোয়া। পাইকারি বাজারে গুজরাতের বিখ্যাত হাতের কাজ আর ভোগ্যপণ্যের ছড়াছড়ি। হাজারো জিনিস ছেড়ে লোকে ঘুড়ি নিয়ে দরাদরি করছে। পরের দিনই উত্তরণ। বাজারে জিনিসের দামও তাই আকাশ-ছোঁয়া। ঘুড়ি ও লাটাই-সুতো কেনবার জন্য প্রচন্ড ভিড় হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে কাইট ফ্লাইং ইন সেফটি। ডজন-দরে ঘুড়ি নিলে ফাউ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে আঙুলের ঠুলি, রঙিন-চশমা, সান গার্ড ইত্যাদি। এই দৃশ্য দেখে দেওয়ালির আগে কলকাতার বাজি-বাজারের কথা খুব মনে পড়ছিল আমার।

যেদিকেই তাকাচ্ছি, রং আর রং। বড় দোকান, ছোট দোকান, রাস্তার ধার—সর্বত্র ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে চ্যাঁচামেচি। আর ঘুড়ির কী বাহার ! অদ্ভুত-অদ্ভুত সব নকশা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। রীতিমত পাকা শিল্পীর কাজ। আমেদাবাদের কাছেই জামালপুর। সেখান থেকে আসে ঘুড়ির নকশা। ডানা-মেলা পাখি, হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষ—আরও কত রকম ঘুড়ি যে বিক্রি হচ্ছে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। নকশার সঙ্গে মিল রেখে ঘুড়ির নামও দেওয়া হয়েছে ভারী চমৎকার। যে-ঘুড়িকে 'চাঁদিয়াল' নামে জানি সেই ঘুড়ির নাম ওখানে 'চাঁদিদার'। গোঁফ বা মোচ-এর মতো যে-ঘুড়ি, তার নাম 'মুচেদার'। বিভিন্ন রংয়ে তৈরি ঘুড়ির নাম 'শিশেদার'। চার রংয়ের চৌখুপি নকশার ঘুড়ি 'চৌপাট'। রঙিন সেলোফেন কাগজের তৈরি একরকম ঘুড়ি দেখলাম। উড়ন্ত অবস্থায় আলোর ফুলকির মতো দেখায়।

শুধু কি ঘুড়ি ! ঘুড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে লাটাইয়ের বাহার। এগুলোও কারিগররা খুব যত্ন দিয়ে তৈরি করেন। গুজরাতের বিখ্যাত কাঠের উপর গালার রঙিন কাজ দেখতে পাওয়া যায় লাটাইয়ের দু'পাশের চাকায়। লাল-নীল-হলদে-সবুজের ছোঁয়ায় লাটাই যেন জ্যান্ত হয়ে ওঠে। গুজরাতিরা বলেন 'ফিরকি'। সরু-সরু কাঠি খুব সুন্দর করে চেঁছে ফিরকির সুতো জড়াবার জায়গাটা তৈরি হয়। তারপর সেটা রঙিন কাগজে মুড়ে দেওয়া হয়। সারি-সারি রঙিন ফিরকি দোকানে ঝুলতে থাকে ফুলের গোছার মতো।

ঘুড়ি লাটাই তো হল, এর পর আছে সুতো। সুতোর দেশ গুজরাত। ভারতবর্ষের নামী সুতোর মিলগুলি এখানেই অবস্থিত। কাপড় তৈরির সুতোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানোর সুতো। পরে সেই সুতোয় কাঁচের গুঁড়ো দিয়ে ধার বা মাঞ্জা দেওয়া হয়। এই মাঞ্জাসুতো লাটাইয়ে জড়িয়ে বিক্রি হচ্ছে। অন্য সময় এই সুতো যে-দামে বিক্রি হয়, উত্তরণ উৎসবের সময় বিক্রি হয় তার চেয়ে অন্তত তিন গুণ বেশি দামে। দেখলাম পাড়ায়-পাড়ায় সুতোয় ধার দেওয়া হচ্ছে। আর রাস্তার ধারে দলে-দলে লোক সেই মাঞ্জা-দেওয়া সুতোয় রং লাগাচ্ছে। এদের বলে 'রংওয়ালা'। উত্তরণের দিন যত এগিয়ে আসে, এই রংওয়ালারাও তত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলেরা বড়-বড় গামলায় ভাতের মন্ডে কাঁচের গুঁড়ো আর রং মিশিয়ে সুতোয় লাগায়। আর মেয়েরা বড়-বড় চরকার মতন লাটাইয়ে সেই রঙিন সুতো গুটিয়ে দেয়। উৎসবের আগের দিন রংওয়ালাদের পারিশ্রমিকও ঢের বেড়ে যায়।

প্রত্যেকেই উত্তরণ উপলক্ষে সাধ্যমতো ঘুড়ি, লাটাই, সুতো কিনে নিয়ে যায় বাড়িতে। বাজার উপচে পড়ে ভিড়ে। বাচ্চাদের সঙ্গে বড়দের উৎসাহও দেখার মতন। সারাদিন ধরে চলে ঘুড়ি ওড়ানো। একজনের কাছে জানতে চাইলাম, এই ঘুড়ি ওড়ানোর পিছনে প্রাচীন বিশ্বাস আছে কি না। তিনি বললেন, "ঘুড়ি ওড়ালে শরীর ও মন ভাল থাকে। আকাশের দিকে তাকালে সূর্যের আলোয় দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। তা ছাড়া এই উৎসব উপলক্ষে মেলামেশা ও ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যায়।"

আমেদাবাদের স্টেডিয়ামে বিরাট ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়। টিকিট কেটে লোকে ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে যায়। সারাদিন ধরে বিভিন্ন বিভাগে চলে প্রতিযোগিতা। ঘুড়ি নিয়ে এই মাতামাতিকে মনে রাখবার জন্য গড়ে উঠেছে ঘুড়ির মিউজিয়াম।

দিনের আলো নিবে এলেও ঘুড়ি ওড়ানো শেষ হয় না। অন্ধকার আকাশে ঘুড়ি উড়তে থাকে। ঘুড়ির শক্ত সুতোয় রঙিন কাগজের ঠোঙা বেঁধে সেই ঠোঙায় জ্বেলে দেওয়া হয় মোমবাতি। আর সেই সব বিচিত্র ঘুড়ি অপরূপ আলোর মালার মতো ভেসে যেতে থাকে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে।

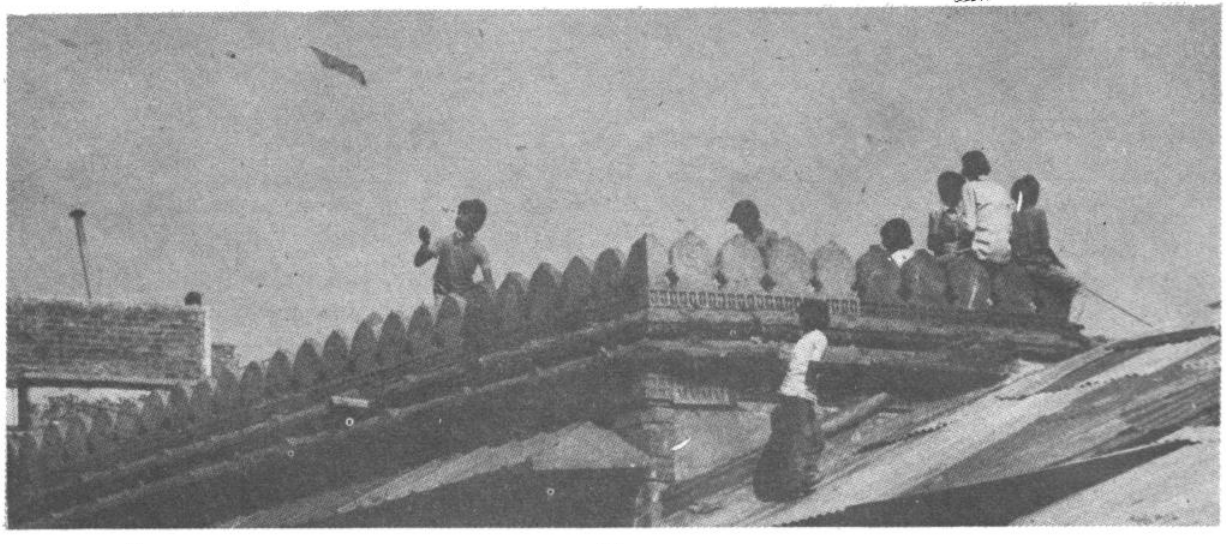

অনুভূতি এমন, যা সঙ্গ দেয় সারাজীবন

মধুর মমতাভরা যত্নের ছোঁয়া জন্ম থেকেই পেয়ে এসেছেন যার ··· সেই, জনসন্স বেবী পাউডার – কোমল যেন মমতার পরশ ··· বিশুদ্ধ আর মৃদু ! এর স্নেহধারা বর্ষিত হয় আপনার ওপরে, দিনের পর দিন ধরে ! তাইতো, শিশুকাল হয়ে গেলেও পার··· জনসন্স বেবী পাউডারের সঙ্গে সম্বন্ধ, সারাজীবন অটুট থেকে যায় আপনার !

কোমল যেন মমতার পরশ জনসন্স বেবী পাউডার

LINTAS J&J 23 2619 BG

ঘরের মধ্যে কে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে···

ফালাকাটা বাংলোর রাত্রি

দেবল দেববর্মা

এই গল্পটা কনকের কাছে শোনা। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। অবশ্য কনক যদি তাই বলে থাকে। তবে ওকে অবিশ্বাস করবার মতো কোনও কারণ খুঁজে পাইনে। যা ডাকাবুকো আর গোঁয়ার-গোবিন্দ স্বভাব। বর্ষাকালে দেশের বাড়িতে একবার একটা খরিশ সাপ বেরিয়েছিল। উঠোনের মাঝখানে সাপটা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। ভয়ে যে যেখানে পারে সরে পড়েছে। কেউ বা ঘরের দরজা ভেজিয়ে লুকিয়ে সাপটার গতিবিধির উপর নজর রাখছে। এমন সময় কনক একটা লোহার রড হাতে নেমে এল। তারপর সুযোগ বুঝে সাপটার কোমরে একটা মোক্ষম আঘাত করতেই সেটা প্রায় ঘায়েল হল। অমনি দমাদম আরও কটা ঘা দিতেই বেচারি ভবলীলা সংবরণ করল। একমাত্র কনকের মতো ছেলেই এমন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে। নইলে রীতিমত ঝুঁকি নিয়ে ফালাকাটার ওই নির্জন, প্রায় পরিত্যক্ত বাংলোতে ওর রাত কাটাবার সত্যি কোনও প্রয়োজন ছিল ?

ঘটনা তেমনি সাদামাটা হলে নিজেকে কাহিনীর নায়ক বলে হয়তো চালিয়ে দিতে পারতাম। বন্ধু-বান্ধব লেখা পড়ে বিশ্বাস করে নিত। কিন্তু এমন একটা পরিবেশে শুধুমাত্র কনককে মানায়। নইলে গভীর রাত্রে ফালাকাটার সেই নির্জন বাংলোয় খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে কনকের সামনে যে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার সাক্ষাৎ পেলে আমি নির্ঘাত মূর্ছা যেতাম। কিন্তু কনক ছেলেবেলা থেকেই দুরন্ত আর দুঃসাহসী। একমাত্র তার পক্ষেই স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকে ফালাকাটার ওই নির্বান্ধব বাংলো বাড়িতে রাত্তিরে বাস করা সম্ভব হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি থেকে ফালাকাটা যেতে প্রায় ঘণ্টা-দুই লাগে। কী যেন একটা কাজ ছিল সেখানে। তা ইচ্ছে করলে সকালে বেরিয়ে দিব্যি বিকেল নাগাদ ফিরে আসা চলে। লোকে তাই করে। কিন্তু কনকের খেয়াল চাপল রাত্তিরটা ফালাকাটায় কাটিয়ে আসবে। শুনে জীবন অবশ্য আপত্তি করেছিল। "ফালাকাটায় কোথায় থাকবেন স্যার ? একটা মান্ধাতার আমলের ডাকবাংলো অবিশ্যি আছে। তবে সেটা ভাঙাচোরা, তাছাড়া।"

"তাছাড়া কী ?" কনক মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

"মানে," জীবন একটা ঢোঁক গিলে বলল, "ডাকবাংলোটার একটা দুর্নাম আছে স্যার।"

"দুর্নাম ?" কনক ভ্রূ কোঁচকাল। বলল, "বুঝেচি, তুমি ভূতের ভয় দেখাচ্ছ, তাই না ?"

"না মানে ঠিক তা নয়। তবে লোকে বলে"—জীবন আমতা আমতা করল।

কনকের রোখ চেপে গেল। ফালাকাটার বাংলোতে সে রাত কাটিয়ে আসবে। ভূত আছে না ছাই। যত সব আজগুবি

গল্প। আর জীবনটা যা ভিতু। একবার অন্ধকারে নিজের ছায়া দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। আর এই ফাঁকে সত্যি যদি ভূত কিংবা প্রেতের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার হয় তাহলে কনক সেটা নিতান্ত সৌভাগ্য বলে মনে করবে। জীবন তার ওপরওয়ালাকে চেনে। একবার যখন জেদ চেপেছে তখন কারও সাধ্য নেই মানুষটাকে নিরস্ত করে। আসলে দোষ তো জীবনের। পাগলকে কখনও সাঁকো নাড়াতে নেই বলতে আছে? ফালাকাটার বাংলোর যে একটা দুর্নাম রয়েছে এই কথাটা স্যারকে জানাতে কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরেই কনক বেরিয়ে পড়ল। জীবন সঙ্গে, লোকটি তার পিওন। ভালমানুষ, এদিককার বাসিন্দা, তাতেই হয়েছে মুশকিল। জীবন এই অঞ্চলটার অন্ধিসন্ধি নাড়িনক্ষত্র সব জেনে বসে আছে। মফস্বলে ট্যুরে যাওয়ার কথা উঠলেই কখন কোন্ সময় বেরুলে সুবিধে তা সে গড়গড় করে বলে চলে। আবার কাজ সেরে কোন্ টাইমে ফেরার বাস পাওয়া যাবে পরীক্ষার পড়ার মতো তাও যেন জীবনের মুখস্থ হয়ে আছে।

জলপাইগুড়ি থেকে বেশ কয়েক মাইল গেলে ফরেস্ট অফিসারের বাংলো। সঙ্গে-লাগোয়া অফিস। বেলা দুটো নাগাদ কনক বাস থেকে সেখানেই নেমে পড়ল। ছোটখাটো একটু প্রয়োজন ছিল। ফালাকাটা যাবার আগে সেটা সেরে নিলেই চলে। রাত্তিরটা যখন ডাকবাংলোতে থাকতে হবে। তখন সাততাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে পৌঁছবার কোনও মানে হয় না। তবু জীবন আগের মতোই খুঁতখুঁত করল, "এর পরের বাস তো সেই বিকেল পাঁচটায়। তাহলে ফালাকাটা গিয়ে পৌঁছতে ধরুন সন্ধে হবে। নতুন জায়গায় রাত্তিরে থাকবেন। দিনমানে গেলে একটু দেখেশুনে নেওয়া যেত।"

এবার কনক রাগ করল। বলল, "সন্ধে হলেই তোমার ভয় বাড়ে, তাই না? তা এত যদি ভয় বাপু, তাহলে না হয় ফিরে যাও। ফালাকাটার ডাকবাংলোতে আমি দিব্যি একলা থাকতে পারব।"

জিভ কেটে জীবন বলল, "আজ্ঞে না স্যার। তাই কখনও হয়? আমি বলছিলাম যে এর আগে তো কখনও ফালাকাটা যাননি।"

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই একই কথা। কনক তাই আর কোনও জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। আসলে ফালাকাটার ওই ডাকবাংলোটার সম্বন্ধে জীবনের মনে একটা ভীতি বদ্ধমূল রয়েছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই তাই সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে এত আগ্রহী।

ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে শুধু কাজ নয়, জমিয়ে গল্প হল। এসব অঞ্চলে দেখা-সাক্ষাতের পর তাই হয়। আড্ডা দেওয়ার লোক মেলে না। তাই তেমন সুযোগ হলে কেউ তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না।

ফালাকাটার ডাকবাংলোতে কনক রাত্তিরে থাকবে শুনে ফরেস্ট অফিসারের মুখভাব যেন সামান্য বদলে গেল। লোকটি ঈষৎ ভ্রূ কোঁচকাতেই কনক সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপারটা কী? আপনিও বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন?"

ফরেস্ট অফিসার মাথা নেড়ে জানাল, "না-না। ঠিক তা নয়। তবে ওই বাংলোটার একটা দুর্নাম আছে শুনেছি।"

এবার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সে বলল, "আপনার সঙ্গে বড় টর্চলাইট আছে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ," কনক উত্তর দিল।

"মোমবাতি?"

"আমার পিওন সব নিয়ে এসেছে। এ-সব ব্যাপারে জীবনের কোনো ভুল হয় না।"

"তবে পরোয়া কিসের?" ফরেস্ট অফিসার যেন তাকে সাহস জোগাল। বলল, "একটু সাবধানে থাকবেন। রাত্তিরে দরকার হলে পিওন কিংবা চৌকিদারকে ডাকতে দ্বিধা করবেন না।"

"সে দেখা যাবে'খন। তবে আমার মশায় ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই।" কনক বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। ঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "বাসের টাইম হল। চলি তা হলে।" সে ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে এগোল।

ফালাকাটা জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে পড়ে। চোখে লাগবার মতো তেমন বড় জায়গা নয়। গঞ্জগোছের, ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। ডাকবাংলোটা রাস্তার ধারে হলে সুবিধে ছিল। কিন্তু বাস থেকে নেমে প্রায় আধ কিলোমিটার পথ হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হয়। লোকালয় পিছনে পড়ে রইল। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কনক একবার সামনে একবার পিছনে তাকাল। বেলা প্রায় ফুরিয়ে এল। সূর্য অস্ত গেছে। একটা ধূসর আবছা আলো এখনও চরাচরে ছড়িয়ে। কনকের হঠাৎ মনে হল আজ রাত্তিরটা যেখানে কাটাবে বলে সে যাচ্ছে, সেখানে নির্জনতা ছাড়াও আরও কিছু যেন তার অপেক্ষায় রয়েছে।

মিনিট-কয়েক হাঁটতেই ডাকবাংলোটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্মৃত কোনও জন্তুর মতো সেটা দাঁড়িয়ে। কাঠের বাড়ি, চারটে মোটা থামের ওপর ভর করে তৈরি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা অতিকায় চতুষ্পদ নিঃশব্দে তার শিকারের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

জায়গাটা সত্যি নির্জন। চারধারে বসতির চিহ্নমাত্র নেই। মার্চের মাঝামাঝি। আকাশ নির্মেঘ নীল। একটা-দুটো তারা সবে ফুটে উঠেছে। বাংলোর দরজায় পৌঁছবার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মাটি থেকে একটু উঁচুতে কাঠের মেঝে। পাঁচ-ছটা সিঁড়ি ভেঙে কনক উপরে উঠে গেল। পাশাপাশি দুখানি ঘর। দরজায় তালা নেই। এক টুকরো দড়ি দিয়ে কড়াদুটো বাঁধা। মাথার ওপরে কাঠের আচ্ছাদনে কোথাও ছিদ্র আছে বলে মনে হল। একেবারে মান্ধাতার আমলের বাড়ি। তারপর কতকাল সারানো হয়নি কে জানে? হাতের টর্চলাইট জ্বেলে উপরে ফেলতেই কয়েকটা চামচিকে কিংবা বাদুড় ডানা মেলে কোথায় উড়ে গেল। এদিক-ওদিক লক্ষ করতেই দেখা গেল, সামান্য একটু দূরে ছোট একটা টিনের ঘর। সেখানে আলো জ্বলছে।

কনক বলল, "চৌকিদার বোধহয় ওখানেই থাকে।"

জীবন সায় দিল, "তাই হবে স্যার।"

টর্চের আলোটা সেদিকে ফোকাস করে কনক চিৎকার করে ডাকল, "চৌকিদার, চৌকিদার।"

মিনিট-দুই পরেই একটা আধবুড়ো লোক ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে এল। কাছে এসে মাথা নুইয়ে তাকে সেলাম দিল।

নিজের পরিচয় দিয়ে কনক বলল, "আজ রাত্তিরটা এখানেই থাকব।"

চৌকিদারটা এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন চিন্তা করল, তারপর বলল, "কামরা তাহলে সাফ করে দিই ?"

"হ্যাঁ, তাই করো।"

ঘরের দরজা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। জানলাদুটো বন্ধ ছিল। একটু ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচকোচ শব্দ করে সেগুলি খুলে গেল। জানলায় গরাদের বালাই নেই। শুধু কাঠের পাল্লা। বাইরে থেকে যে-কেউ সেটা টপকে ভিতরে আসতে পারে। কনক নজর বুলিয়ে দেখল ঘরের আসবাবপত্রের অতি জীর্ণ দশা। একটা সিঙ্গল বেড। তার উপরে বহুকাল আগে কেনা একটা ছোবড়ার গদি। তার দু-তিন জায়গায় গর্ত, যেন কোনও হিংস্র প্রাণী কামড় দিয়ে খানিকটা খুবলে নিয়েছে। ঘরের মধ্যে একটা বেতের চেয়ার। একটা তেপায়া টেবিল। সেটা নড়বড়ে বলে দেয়ালের একটা পেরেকের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

ঘর পরিষ্কার করে চৌকিদার এবার ভিজিটর্স খাতাটা তার সামনে খুলে ধরল। ইতিমধ্যে জীবন একটা মোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে কনক দেখল মাস-চারেক আগে একজন ডাক্তার এই বাংলোতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে গেছেন। তাও তিনি রাত্রিবাস করেননি। তার প্রায় মাস-ছয় আগে তিন-চার জন লোক এখানে এসে উঠেছিল। তবে তারা কখন চলে গিয়েছে খাতায় সে কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

ভিজিটর্স বুকে নিজের নাম-ধাম লিখে কনক একবার চৌকিদারের মুখের দিকে তাকাল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাঁধে একটা গামছা। বয়স পঞ্চাশ কিংবা ষাটও হতে পারে।

কনক জিজ্ঞাসা করল, "রাত্তিরে খাওয়ার কী ব্যবস্থা করতে পারবে ?"

"আজ্ঞে জিনিসপত্র তো কিছু নেই।" চৌকিদার একটা হতাশ ভঙ্গি করে জানাল। তারপর একটু চিন্তা করে বলল, "তবে রাস্তার ধারে একটা দোকান আছে। সেখান থেকে পাউরুটি আর দুধ এনে দিতে পারি।"

অগত্যা তাই। কনক পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট তার দিকে এগিয়ে দিল। বলল, "পাউরুটি কিনতে যাওয়ার আগে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারো ?"

"আজ্ঞে তা পারব।" লোকটা খুশি মনে হল। পরক্ষণেই যেন নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, "কিন্তু চিনি তো নেই স্যার। যদি চিনি না দেওয়া চা খান তাহলে এখুনি বানিয়ে আনছি।"

"বেশ, তাই নিয়ে এসো।" যা অবস্থা তাতে এর চেয়ে বেশি আশা করা অনুচিত ভেবে কনক আর কথা বাড়াল না।

চৌকিদার তখুনি চলে গেল, সঙ্গে জীবনও। মোমবাতির আলোকে ঘরটা এখন মোটামুটি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ছোবড়ার সেই গদির উপর জীবন একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে গেছে। কনক একবার হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট বাদে ফের উঠে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে এসে টর্চের আলোটা এদিকে-সেদিকে ফোকাস করে চতুর্দিকে লক্ষ করতে লাগল। ডাকবাংলোর সামনেই একটা বাঁধানো কুয়ো। দূরে কয়েকটা গাছ, আর কিছুই নজরে এল না। প্রায় চার মাস পরে

এই বাংলোবাড়িতে মানুষের পদার্পণ ঘটল। কতকাল যে এখানে কেউ রাত্রিবাস করেনি তাই বা কে বলতে পারে ?

মিনিটকয়েক না যেতেই চৌকিদার চায়ের কাপ নিয়ে ফিরল। তার দিকে সেটি এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই নিন স্যার, কাল সকালে চিনি এনে ভাল চা তৈরি করে খাওয়াব।"

লোকটা এবার রাস্তার ধারের সেই দোকান থেকে দুধ আর পাউরুটি আনতে গেল। জীবন তার কাছে বসে রইল।

কনক বলল, "কী হে জীবন, জায়গাটা কেমন লাগছে ?"

"আজ্ঞে বড় নির্জন। তাই রাত্তিরে একটু সাবধানে থাকা উচিত।"

"এত সাবধান হবার কী আছে ?" কনক হেসে বলল, "আমাদের কাছে তো আর টাকাকড়ি নেই যে চোরে এসে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া এই নির্বান্ধব পুরীতে কখনও চোর-ডাকাত আসে ?"

ইতিমধ্যে কনক তার জামা খুলে চেয়ারের উপর বিছিয়ে দিয়েছে। ব্যাগ থেকে একটা পাজামা বের করে সে পরে নিল। এখন বেশ হালকা, নিজেকে ছিমছাম লাগছে। চৌকিদার বারান্দায় এক বালতি জল রেখে গিয়েছিল। ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে কনক বেশ স্বস্তি বোধ করল।

রাতটা দুধ-পাউরুটি খেয়ে কাটাতে হবে। চৌকিদার অবশ্য একটা বড় রুটি নিয়ে এসেছিল। তার অর্ধেকটা সে জীবনকে খেতে দিল। খাওয়া শেষ হলে জীবন হঠাৎ বলল, "স্যার, আমি চৌকিদারের ঘরে শোব ? ওখানে বিছানা আছে।"

এতে আপত্তি করা চলে না। ঘরের ভেতর তো একটা খাট। তার উপরে ছোবড়ার গদি পাতা। জীবনকে তাহলে মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়। তার চেয়ে চৌকিদারের ঘরে গেলে

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

বোর্নভিটা — মল্টেড ব্রাউন পানীয় আহার, যাতে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ প্রস্তুত করেছে ক্যাডবেরি — ১০০ বছরেরও ওপর যারা পানীয় আহার তৈরীতে বিশেষজ্ঞ।

প্রতি কাপ দুধে, দুচামচ বোর্নভিটা মিশিয়ে খেলে, পরিবারের প্রত্যেকে পাবে পুষ্টি ও আস্বাদে ভরা এক পানীয়। বোর্নভিটা বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্যে দারুণ উপকারী। অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যে ওদের দিনে দুবার বোর্নভিটা দিন — আর লক্ষ্য করুন, শরীর বৃদ্ধির উপযোগী যথাযথ শক্তি পেয়ে ওরা কেমন তরতরিয়ে বাড়ছে!

বাচ্চাদের প্রতি যত্নশীলা এক মা বলেন: "আমার বাচ্চাদের দুধে বোর্নভিটা মিশিয়ে খাওয়াই বলে, ওরা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি আর শক্তি যথাযথভাবে পায় — তাইতো পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হবেই খাওয়াতে।"

এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ষ.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

একটা বিছানায় দুজনে ভাগাভাগি করে শুতে পারবে।

তাই কনক বলল, "বেশ তো। চৌকিদারের অসুবিধে না হলে তুমি ওখানেই শুয়ে থাকো।"

"আজ্ঞে না, ওর আপত্তি নেই।" জীবন জবাব দিল। শেষে বলল, "তবে রাত্তিরে দরকার হলে আমাকে নিশ্চয় ডাকবেন স্যার। দুজনে তখুনি দৌড়ে আসব।"

ঘরের দরজায় খিল তুলে দিয়ে কনক বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। ব্যাগ থেকে একটা পুরনো পত্রিকা বের করে পড়তে শুরু করল। তারপর চোখদুটো ঘুমে জড়িয়ে আসছে মনে হতে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল মনে নেই। হঠাৎ ঘুমটা যেন ভেঙে গেল। হাতের টর্চলাইটটা বের করে কনক একবার আলো জ্বালল। বালিশের নীচে থেকে ঘড়িটা বের করে দেখল মাত্র সাড়ে-নটা বাজে। এখন এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। নতুন জায়গা, তারপর ভাত না খেলে কখনও রাত্তিরে ঘুম আসে? বিছানা থেকে নেমে কনক দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে ডাকল, "চৌকিদার, চৌকিদার।"

তার ডাক শুনে চৌকিদারের আসতে মিনিটকয়েক দেরি হতে পারে ভেবে কনক ফের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে মনে হল ঘরের মধ্যে কে যেন হেঁটে তার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে স্পষ্ট নজর হয় না। তবু কনক যেন দেখতে পেল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কাঁধে গামছা নিয়ে সেই চৌকিদার খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে। শুধু চোখ দুটো কেমন অস্বাভাবিক চকচকে। কনক বলল, "আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?"

চৌকিদার কোনও জবাব দিল না। পেছন ফিরে চলে গেল, বোধহয় চা তৈরি করে আনতে। কনক ভাবল এত রাত্তিরে চায়ের হুকুম শুনে লোকটা হয়তো মনে মনে বিরক্ত হয়েছে।

বিছানায় শুয়ে সে এলোমেলো এইসব চিন্তা করছিল। এমন সময় টেবিলের উপর কে যেন ঠক করে একটা চায়ের কাপ রাখল। কনক বিছানা থেকে নামবার আগেই সেই চৌকিদার প্রায় ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কনকের আর কোনও সন্দেহ রইল না যে রাত্তিরে ফের চা তৈরি করতে হল বলে লোকটা তার উপর চটে গিয়েছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কনক বেশ আরাম বোধ করল। বেশ ভাল চা, চিনি মেশানো। নিশ্চয় রাস্তার ধারের সেই দোকান থেকে রুটি কিনতে গিয়ে চৌকিদার চিনি আনতে ভুল করেনি। না, ব্যাপারটা কাল সকালে ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আসলে কনক পয়লা নম্বরের চা-খোর। দিনে-রাতে অন্তত দশ-বারো কাপ চা নইলে তার চলে না।

বিছানা থেকে নেমে ঘরের দরজায় খিল দিয়ে কনক ফের শুয়ে পড়ল। কিন্তু মনের মধ্যে কী যেন একটা অস্বস্তি খচখচ করছিল। চৌকিদার অমন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন? আর চোখদুটো অন্ধকারে এমন অস্বাভাবিক চকচকে দেখাচ্ছিল! শেষে কনক ভাবল সমস্ত ব্যাপারটা হয়তো তার মনের ভুল। অন্ধকারে নিশ্চয় তার ভ্রম হয়েছে। নইলে মানুষটা তো দিব্যি চা তৈরি করে এনে টেবিলে রেখে চলে গেল।

খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখল সবে আলো ফুটছে। এক কাপ চায়ের জন্য মনটা তৃষিত হতেই কনক ফের চৌকিদারকে ডাকল। প্রথমে একবার, তারপর আরও জোরে দুবার। প্রায় তখুনি ঘুম-ভাঙা চোখে চৌকিদার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কনক হেসে বলল, "তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খাওয়াও দেখি। ঠিক কাল রাত্তিরের মতো।"

"চিনি তো নেই স্যার।" চৌকিদার প্রায় কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে জানাল। বলল, "একটু বাদে দোকান খুললে নিয়ে আসব।"

"বা রে! কাল রাত্তিরে তো তুমি চিনি দিয়ে চা তৈরি করে আনলে।"

"আমি?" লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, "আপনাকে রাত্তিরে চিনি দিয়ে চা বানিয়ে দিয়েছি?"

"হ্যাঁ," কনক ঘর থেকে চায়ের কাপটা এনে তাকে দেখাল। সামান্য একটু চা অবশিষ্ট ছিল। সেটা জিভে ঠেকিয়ে বলল, "এই তো মিষ্টি লাগছে।"

লোকটি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, "তখন কত রাত্তির হবে স্যার?"

"এই ধরো সাড়ে-নটা।"

"অসম্ভব।" লোকটি মাথা নাড়ল। বলল, "অন্তত রাত্তির দশটা-এগারোটা পর্যন্ত আমরা দুজনে গল্পগুজব করেছি।"

"তার মানে?" কনক ভ্রূ কোঁচকাল। "তাহলে রাত্তিরে চা তৈরি করে টেবিলের উপর কে এসে রেখে গেল?"

কখন জীবন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে বলল, "আপনাকে পই-পই করে বারণ করলাম স্যার। এই সব ভূত-বাংলোতে রাত্তিরে থাকবেন না। যদি তেমন কিছু হয়ে যেত—"

চৌকিদার বলল, "সন্ধেবেলা আপনাকে আর বলিনি হুজুর, যদি ভয়-টয় পান। বছর-চার আগে এখানে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চাকর। কিচিন রুমে রাত্তিরে সে রান্না করছিল। তারপর ভদ্রলোক নাকি চা বানাতে বলেছিলেন। সেই চা দিতে দেরি। আর তাই নিয়ে মাথা গরম। রাগের মাথায় ভদ্রলোক সজোরে এক থাপ্পড় মেরেছিলেন গালে। বেভুলে কানের কাছে লেগে লোকটা পড়ে মরে যায়। তারপর থানা-পুলিশ। কিন্তু সেই থেকে এই বাংলোর একটা দুর্নাম রটে গেছে। রাত্তিরবেলা কিচিন-রুমে কে যেন রান্না করে, চা বানায়। কাপ নাড়াচাড়া করার শব্দ ঘরে বসে আমি শুনিচি।"

কনক হতবাক। সে শুধু ভাবছিল—গতকাল রাত্তিরের সেই লোকটাকে। ঠিক চৌকিদারের মতো খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। কাঁধে গামছা। আর চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে। কিন্তু তখন তো সাড়ে-নটা বাজে। রাত বেশি নয়। আর চৌকিদার বলছিল ওরা দুজনে জেগে। তাহলে কনকের ডাকাডাকি কেন শুনতে পায়নি?

দ্রুত পায়ে ঘরের ভিতর ঢুকে সে বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করে আনল। আশ্চর্য! কী ভুলই না সে করেছিল।

কনকের গলা শুকিয়ে কাঠ। তখন তাহলে কত রাত্তির? আর একবার ঝুঁকে সে হাতঘড়িটার দিকে তাকাল। কাঁটাদুটো স্থির।

সাড়ে-নটা বেজে ঘড়িটা কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

বূস্ট

সারাদিন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার জন্য সুস্বাদু শক্তিদায়ী পানীয়

আপনার সন্তানটি আজকের এই ধাবমান অগ্রগতির যুগের এক বাড়ন্ত সন্তান।

আজকের এই জটিল ইলেকট্রনিক যুগের সব খেলাই তার জীবনে এক চ্যালেঞ্জ। তার আগ্রহী এবং কৌতুহলী মন এই জটিলতাকে জানবার জন্য সে অনেক বেশী পড়াশুনো করে, অনেক বেশী পরিশ্রম করে-আনন্দ পায়। স্কুলে, টেনিস কোর্টে অথবা যে কোন নতুন খেলাতেই সে পরিশ্রম করতে আগ্রহী কারণ সে সর্বত্রই সর্বাগ্রে থাকতে চায়।

সত্যিই, আপনার সন্তানের আজ এক ক্ষিপ্র, গতিশীল জীবন, এক তীব্রগামী ট্রেনের মতই দুর্বার গতিতে তার দিনগুলি এগিয়ে চলেছে।

বূস্ট — এক চকলেটের স্বাদে সুস্বাদু শক্তিদাতা

এই স্ফূর্তি ভরা প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডে আপনার সন্তানের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং তার দিনগুলি এক নির্ভরযোগ্য শক্তিদায়ী পানীয় দিয়ে শুরু করাই সর্বোত্তম উপায়।

বূস্ট, ঘন দুধ, সোনালী দানার গম, মল্টেড বার্লি এবং কোকোর মতন শক্তিবর্দ্ধক উপাদানে তৈরী একটি সুস্বাদু পানীয়।

বূস্ট দুধে মিশিয়ে খেতে চমৎকার। সারাদিনের এই প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডের জন্য সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে সকালের জল খাবারের সঙ্গে বূস্ট একটি আদর্শ পানীয়।

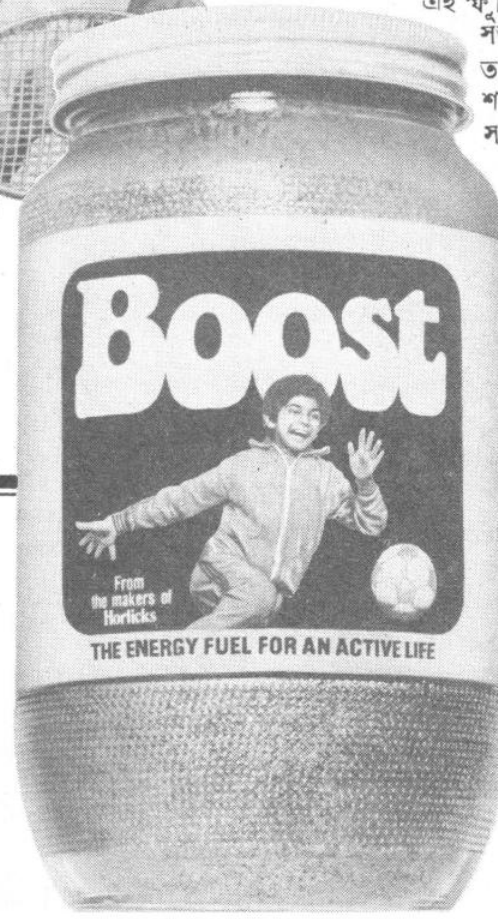

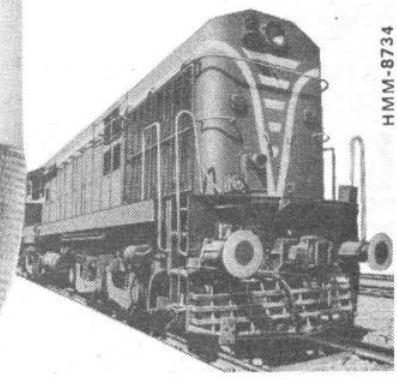

HMM-8734

বূস্ট

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

ডাক্তারবাবু বলছেন

বর্ষাকালের খাওয়া-দাওয়া

বর্ষাকালে কী ধরনের খাবার খাব, আর কী ধরনের খাবার খাব না, এ-বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার দরকার। কী বলো ? প্রথমে খাওয়ার কথা হোক, তারপরে না-খাওয়ার কথা হবে।

বর্ষাকালে টাটকা খাবার খেতে হবে। খুব বড় মাছ বা মাংস বর্ষাকালে বেশি খাওয়া উচিত নয়, ছোট-ছোট তাজা মাছের ঝোল, ডাল, ভাত খাওয়াই ভাল। মাছ যদি খুব বড় হয়, তাহলে ছাল ফেলে দিয়ে ভেতরের অংশ খাবে। মাংস খেলে দোষ নেই, তবে দেখতে হবে টাটকা মাংস কি না। বাসী মাংসে খুব বেশি জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া মাংসে পচন ধরলে সেই পচন পেটের গোলমাল বাধাতে পারে। ডিম খেতে আপত্তি নেই, তবে রোজ ডিম খেলে শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে পড়তে পারে। যদি রোজ ডিম খেতে ইচ্ছে করে, তাহলে কুসুম বাদ দিয়ে সাদা অংশ খাবে, তাতে শরীরও ভাল থাকবে, হজমও ভাল হবে।

নিরামিষ তরকারির মধ্যে সবচেয়ে আগে নিমপাতা ভাজা অথবা উচ্ছে-করলা ভাজা বা শুকতো খাওয়া সবচেয়ে ভাল। তেতো খেলে মুখের এবং পাকস্থলী অন্ত্রের জারক রসের ভাল নিঃসরণ হয়, ফলে হজমও হয় বেশ ভাল। তেতোর পর যদি শাক থাকে মন্দ হয় না। শাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে, তা ছাড়া শাক খেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়ে যায়। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রোগ হয় কোষ্ঠ-কাঠিন্যের জন্য। নিশ্চয়ই আলু খেতে পারো, তবে শক্ত আলু নয়। সেই আলু খেলে হজম হবে না। আলুতে শরীরে গ্লুকোজ তৈরি হয়। আর ছুটোছুটি হুটোপাটি পড়াশুনা করতে গেলে এনার্জির দরকার, আর আলু সেই এনার্জি দেয়। সজনে ডাঁটা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে পারো, এতে দুটো উপকার হবে। সজনে ডাঁটার রস অ্যান্টিসেপটিক, তাই সজনে ডাঁটা খেলে পেট ভাল থাকবে। দ্বিতীয়ত, ডাঁটা যত চিবোবে, অন্ত্রগ্রন্থির রস তত নিঃসৃত হবে। অন্ত্রগ্রন্থির রস যত বেরোবে, হজমও তত ভালভাবে হবে।

সবশেষে বাড়িতে পাতা টক দই যদি একটু খেতে পারো, উপকার হবে। দই অন্ত্রের ফ্লোরাগুলিকে সজীব ও সক্রিয় করে তোলে, আর এই ফ্লোরাই আমাদের খাদ্য হজম করায়।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

জেনে নাও

কাঁচায় টক কিন্তু পাকায় মিষ্টি কেন

এক-এক ফলে এক-এক রকম আস্বাদ। পাতিলেবু টক, কিন্তু পাকা আঙুর মিষ্টি, কমলালেবুতে অনেক সময় না-টক না-মিষ্টি—এমন একটা স্বাদ।

ফলে সাধারণভাবে অ্যাসিড, সুগার, ভিটামিন, প্রোটিন, শ্বেতসারের সঙ্গে থাকে আরও কিছু-কিছু পদার্থ। কোন্ পদার্থ ঠিক কী পরিমাণে আছে তার ওপরেই এক-এক ফলের এক-এক রকম আস্বাদ।

যে ফল বেশি টক, তাতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। যার আস্বাদ মিষ্টি, তাতে থাকবে সুগার বা শর্করা বেশি।

কিন্তু একই ফলে কাঁচায় দুর্দান্ত টক কিন্তু পাকায় গুড়ের মতো মিষ্টি—এটা হয় কেমন করে ? যেমন আম—কাঁচা পাকায় তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

কাঁচা আমে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। তাই কাঁচা আম টক। কিন্তু আম যখন পাকে, তখন নানা রকম বিক্রিয়া চলে তার মধ্যে। তখন এইসব অ্যাসিড শর্করায় বদলে যায়। পাকা আমে তাই অ্যাসিড কম কিন্তু শর্করা বেশি।

তাই কাঁচা আম টক হলেও পাকা আম খেতে মিষ্টি।

সিনেমার পর্দা অমসৃণ আর সাদা কেন

সিনেমার পর্দা সব সময় সাদা আর অমসৃণ কেন ? সিনেমার পর্দা যদি মসৃণ হত, তাহলে যে রশ্মি গিয়ে পড়ত তার ওপরে, তা কেবল একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত হত বা ফিরে আসত। সবদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত না।

প্রতিফলিত রশ্মি সব যদি যায় একদিকে, তাহলে সিনেমা হলের কেবল একদিকের দর্শকরাই পর্দার প্রতিবিম্ব দেখতে পারে। সবদিকের দর্শকরা নয়। অথচ সিনেমা যারা দেখতে এসেছে তারা সবাই তো ছবিটা দেখতে চাইবে।

কিন্তু পর্দা অমসৃণ হলে অবস্থাটা একেবারে উলটো রকমের হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিফলিত রশ্মি তখন আর একটা দিকে না গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। একে বলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন। আর তাই হলের সব অংশ থেকে পর্দায় ছবি দেখা যাবে।

কিন্তু সিনেমায় পর্দা সাদা হয় কেন ?

সাদা বস্তু কোনো রঙকেই শুষে নেয় না। সবাইকে সে ফিরিয়ে দেয়। সেই জন্যে সাদা পর্দার ওপরে যত রঙের রশ্মি এসে পড়ে, তারা সব প্রতিফলিত হয়। আর সব রশ্মিই যদি প্রতিফলিত হয়, তাহলে ছবি তো উজ্জ্বল দেখাবেই।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

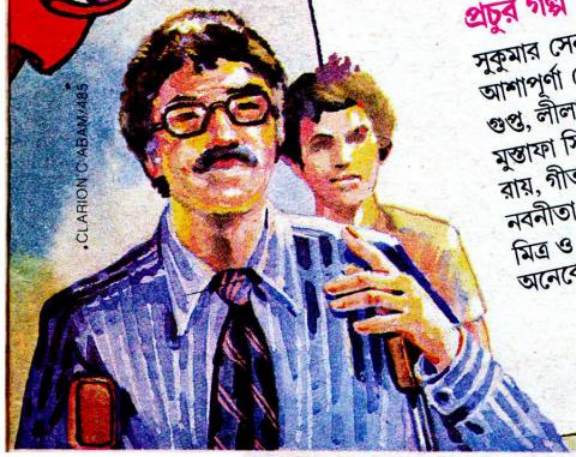

এবারের পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় সবাই জমায়েত!
প্রোফেসর শঙ্কু, ঋজুদা, কাকাবাবু, সন্তু, গোগোল—আরও কত শত চরিত্র যা আজ কিশোর-সাহিত্য জমিয়ে রেখেছে
আটটি উপন্যাস
সত্যজিৎ রায় (সুবিশাল শঙ্কু-কাহিনী), সমরেশ বসু, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ, সমরেশ মজুমদার
দুটি বড়গল্প
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
সম্পূর্ণ চিত্রকাহিনী
ওয়াল্ট ডিজনির 'গুঙ্গার গল্প'
প্রচুর গল্প
সুকুমার সেন, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, লীলা মজুমদার, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, তারাপদ রায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, শিবশঙ্কর মিত্র ও আরও অনেকে
কবিতা ও ছড়া
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (দুটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা), অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, কবিতা সিংহ, সুনীলকুমার নন্দী, তরুণ সান্যাল, আরও অনেকে
ভ্রমণকাহিনী
নারায়ণ সান্যালের 'ছোট্ট মোদের জগৎখানা', মঞ্জরী লাহিড়ীর 'সিংহ-সন্দর্শন'
পরীক্ষার্থীদের জন্য
হেড-এগজামিনারদের লেখা 'কী করে নম্বর বাড়াতে হয়'
খেলাধুলো
ফুটবল নিয়ে লিখেছেন উমাপতি কুমার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। আর ক্রিকেটের নতুন রাজপুত্র আজহারউদ্দিন অর্থাৎ 'আজু'কে নিয়ে লিখেছেন রাজু মুখোপাধ্যায়
সেইসঙ্গে
ধাঁধা, মজা, শব্দসন্ধান, ম্যাজিক, ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'খেলার মাঠের চিকিৎসা', পার্থসারথি চক্রবর্তীর বিজ্ঞানবিচিত্রা ও আরও অজস্র আকর্ষণ
দাম : ২৮.০০ টাকা
আনন্দমেলা
তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

রোভার্সের রয়

রোভার্স দলকে বিপদে ফেলতে চাইছে কে ? তার উদ্দেশ্য কী ?

ক্রিটে বেড়াতে এসেছে রোভার্স দল। প্রদর্শনী দুটি খেলায় জিতেছে। চূড়ান্ত খেলা স্থানীয় পেশাদার দলের বিরুদ্ধে। কিন্তু কেউ শত্রুতা করছে রোভার্সের সঙ্গে। বিস্তর খেলোয়াড় অসুস্থ, নয় জখম। রয় কথা বলছে রিপোর্টারদের সঙ্গে···

আপনার ফিট-খেলোয়াড়ের সংখ্যা নাকি মাত্র সাত ?

হ্যাঁ, তাই জুনিয়র তিনজনকে নামাব। স্থানীয় একটি ছেলেকেও জার্কাডির বিরুদ্ধে নামাচ্ছি।

জিততে পারবেন ?

সামনে ইংলিশ লিগ, হেরে গেলে কি টিমের মনোবল নষ্ট হবে না?

ঠিক বলেছেন, কিন্তু···

খেলব বলে যখন কথা দিয়েছি, তখন খেলবই।

রয় অটোগ্রাফ দিচ্ছে···

কাল নাকি গরম আরও বাড়বে !

বটে ?

শুনলে তো ? কাল খেলা। আজ সন্ধেয় সবাই হোটেলেই থাকো।

নেমে পড়ো রয় !

কী করে যে এ-ম্যাচ খেলব, ভেবে পাচ্ছি না !

ভাঙা টিম নিয়ে খেলা যায় ?

রয়, ডেকে পাঠাল ওয়েটার নিকোসকে···

আজ বারান্দায় খানা লাগাও।

বেশ তো, তা-ই হবে।

সেই সন্ধ্যায়…
খেতে বসুন সবাই…
আজ স্পেশাল খানার ব্যবস্থা !
ওরেব্বাবা
দারুণ দেখতে !
গন্ধেই তো প্রাণ তর !
হাত লাগাও !
দূরে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি
এই খাবারের মজা টের পাবে কাল বিকেলে !
জার্কাডি ও রোভার্স মাঠে নামছে…
রয়ের পিছনে জর্গো ডিমু!
দারুণ ব্যাপার
বাচ্চা-ছেলে ! নামানো কি ঠিক হল ?
জর্গোকে সবাই জর্জ বলে ডাকে…
ভেবো না জর্গো, প্রচুর সুযোগ দেব !
ঠিক আছে !
খেলা শুরু হল…
ছেলেটা কেমন খেলবে. কে জানে !
জার্কাডি ! জার্কাডি !
মিড-ফিল্ড থেকে রয় হঠাৎ…
প্যাকো ডিয়াজকে দিয়েছে !
প্যাকো গোল দেবেই ।
গরমে কাবু হবে না ।
প্যাকো এগোচ্ছে…
জোর দৌড়চ্ছে !
জার্কাডি পেরে উঠছে না !
হঠাৎ পেটে হাত চেপে বসে পড়ল প্যাকো…
কী হল ওর ?
আঃ ! উঃ !
প্যাকো বসলে তো রোভার্সের সর্বনাশ !
ভাবতে পারো, এবারে কী কাণ্ড হতে চলেছে
এর পরে আগামী সংখ্যায়

গাঁটে গাঁটে ব্যথার চোটে ওঁর সারা দিনটাই কি নষ্ট?

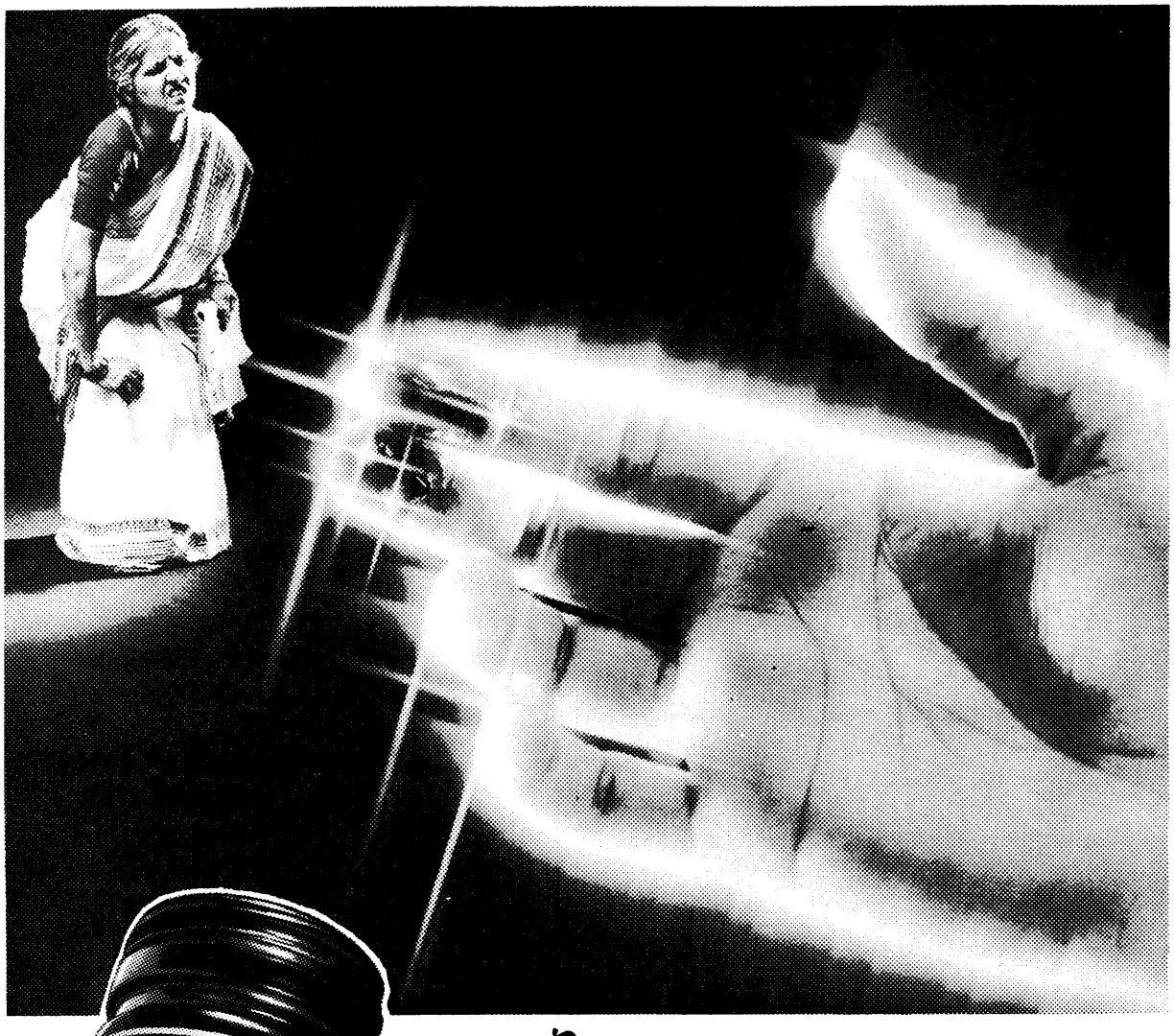

ব্যথা উপশমের গুণ তো আপনার হাতে!

আপনার দরদী হাতের পরশ আর আয়োডেক্সের ব্যথা উপশমের শক্তির চমৎকার ওর দুই-ই দরকার। তাই, আয়োডেক্স সবসময়ে হাতের নাগালেই রাখুন। কারণ, আয়োডেক্সে আছে আয়োডিনের গুণ, যা জখম টিস্যুকে সারিয়ে তোলে, আর আছে মিথাইল স্যালিসিলেট, যা ব্যথা-বেদনার জড়কে নির্মূল করে।

আয়োডেক্স লাগালে দিনে দুবার, দু'গুণ কাজে চমৎকার

ডাক্তারদের মতে ব্যথা-বেদনা পুরো কমে না যাওয়া পর্যন্ত, আয়োডেক্স লাগানো উচিত দিনে দু'বার...এবং ব্যথা কমার পরেও আরো কয়েক দিন...ব্যথা হ'ল উপসর্গ মাত্র, বেদনার আসল কারণ হ'ল জখম টিস্যু।

সুতরাং, আপনার প্রিয়জন যখনই গাঁটের আড়ষ্টতা, মচকানি, পেশীর খিঁচ ধরা, বা দেহের ব্যথা-বেদনার চোটে কষ্ট পাবেন, তখনই আপনার হাতের পরশে আলতো মালিশে আয়োডেক্স লাগান—দিনে দু'বার। আর দেখুন, ওরা কেমন দু'গুণ চটপট সেরে চাঙ্গা হয় আর আপনার দরদী হাতের গুণ গায়।

আয়োডেক্স®—ব্যথা উপশমের গুণের শক্তিতে ভরপুর খাস বাম

SKOF—এক এসকেএফ উৎপাদন

ELL-1610

(জাপানি উপকথা)

ঠোঁট-কাটা চড়ুই

নন্দলাল পাল

বহুদিন আগের কথা। জাপানের হক্কাইডো দ্বীপে এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধা বাস করত। ওরা ছিল স্বামী-স্ত্রী। বৃদ্ধ লোকটি খুব দয়ালু ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাদের একটা পোষা চড়ুইপাখি ছিল। কোনও সন্তান তাদের ছিল না বলে বৃদ্ধ চড়ুইপাখিটিকে নিজের সন্তানের মতো আদর করত। বৃদ্ধা কিন্তু পাখিটিকে নিয়ে এই আদিখ্যেতা সহ্য করতে পারত না।

একদিন বৃদ্ধ জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেল। আর বৃদ্ধা এদিকে কুয়োতলায় গিয়ে ময়লা জামা-কাপড়গুলো ধুতে লাগল। সে জামা-কাপড়গুলো ধুয়ে কলপ দেওয়ার জন্য তৈরি বার্লিটা আনতে রান্নাঘরে গেল। কাপড়ে কলপ দেবে বলে সে খুব ভালভাবে বার্লিটা তৈরি করে রেখে গিয়েছিল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, কোথায় গেল সে বার্লি! পাত্রটি খালি পড়ে আছে। একটু ছিটেফোঁটাও নেই বার্লির। একটু আগেই সে বার্লিটা ফুটিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে রেখে গেছে। কে এই বার্লিটা খেয়ে গেল? সে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল,এটা কোনও বেড়াল-টেড়ালের কাণ্ড নয় তো?

খাঁচা থেকে চড়ুই বলল, "কী খুঁজছ, গিন্নিমা?"

বৃদ্ধা বলল, "আমি দেখছি কে আমার বার্লিটা খেয়ে গেল। কাপড়ে কলপ দেব বলে বার্লিটা তৈরি করে রেখে গেলাম একটু আগে, আর এরই মধ্যে কে সেটা খেয়ে গেল?"

চড়ুই বলল, "ক্ষমা করো। আমিই বার্লিটা খেয়ে ফেলেছি।"

বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বলল, "কী, তুমি খেয়েছ?"

চড়ুই বলল, "হ্যাঁ, গিন্নিমা। এটা তোমার এত কাজের, বুঝতে পারিনি। আমার খুব খিদে পেয়েছিল, তাই খেয়ে ফেলেছি। আর এই বাটিটাতেই তো আমাকে রোজ খেতে দাও। তাই ভাবলাম, বোধহয় আমার জন্যই এ খাবারটা বানিয়েছ।"

পাখিটা নিজের দোষ স্বীকার করে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল।

কিন্তু বৃদ্ধা খেপে গেল। এমনিতেই সে পাখিটাকে সহ্য করতে পারে না। তার ওপর সে তার কলপ দেওয়ার বার্লিটা খেয়েছে।

বৃদ্ধা চিৎকার করে বলল, "বজ্জাত পাখি, আমার এত কষ্ট করে তৈরি বার্লি তুমি খেয়েছ। তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।" এই বলে সে ঘর থেকে একটা কাঁচি নিয়ে এল এবং পাখিটাকে বাঁ হাতে ধরে বলল, "আমি তোমার ঠোঁটটা কেটে ফেলব।"

পাখি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু বৃদ্ধা চট করে তার ঠোঁটটা কেটে ফেলল। তারপর পাখিটাকে ছুঁড়ে ফেলে বলল, "ভাগ্ এবার, হতভাগা পাখি।"

বৃদ্ধ জঙ্গলে কাঠ কাটছে। সে জানে না তার বাড়িতে কী ঘটে গেছে। সে রোজকার মতো একগাদা কাঠ কেটে বোঝা বেঁধে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরল।

বাড়িতে এসেই বৃদ্ধ চড়ুইপাখির খাঁচার কাছে গেল। কিন্তু এ কী!

কোথায় গেল পাখি? খাঁচাটা তো খালি পড়ে আছে। সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, "চড়ুইটা কোথায়?"

বৃদ্ধা এমন ভান করল যেন সে কিছুই জানে না। সে বলল, "কোথায় গেল, কে জানে।" এমনভাবে সে কথাটা বলল যেন

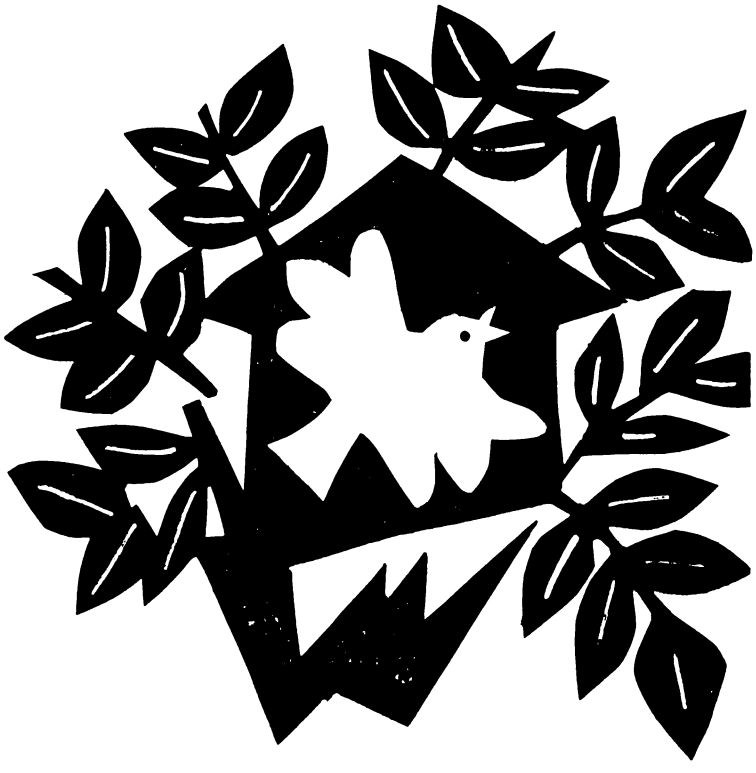

এটা চিন্তা করার মতো কোনও ব্যাপারই নয়।

বৃদ্ধ উত্তেজিত ভাবে বলল, "পোষা পাখিটা তো আর নিজে খাঁচার দরজা খুলে চলে যেতে পারে না। আমি যখন বাড়ি ছিলাম না তখন নিশ্চয়ই তুমি এমন কিছু করেছ যাতে সে উড়ে চলে গেছে। তুমি ঠিক করে বলো কী করেছিলে?"

বৃদ্ধের জেরার চোটে তার স্ত্রী কথাটা আর চেপে রাখতে পারল না। সে আমতা-আমতা করে বলল, "আমি কাপড়ে কলপ দেব বলে খানিকটা বার্লি বানিয়ে রেখেছিলাম। আমি যখন কুয়োতলায় কাপড় কাচছিলাম, তখন পেটুক পাখিটা তার সবটা চেটেপুটে খেয়েছে। এতে আমি রাগ সামলাতে পারিনি। আমি তার ঠোঁটটা কেটে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

কথাটা শুনে বৃদ্ধের দুঃখের শেষ রইল না। সে বলল, "ছোট্ট একটা পাখি। বার্লিটা না হয় খেয়েই ফেলেছে, এর জন্য তুমি নিষ্ঠুরের মতো তাকে এত বড় শাস্তি দিলে। আহা! কী করে তুমি তার ঠোঁটটা কেটে ফেলতে পারলে? আমি বাড়ি থাকলে এটা তুমি করতে পারতে না।"

পরদিন সকালে বৃদ্ধ সেই পাখির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তার স্ত্রী মানা করল। কিন্তু সে তা কানে নিল না। বৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়ে একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে—

ঠোঁটকাটা চড়ুইপাখি, কোথায় তুমি বলো,
আমি তোমায় খুঁজে মরি, এসো এসো এসো।

সেই জঙ্গলের একপাশে ছিল চড়ুইপাখির বাড়ি। বৃদ্ধা তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর সে তার বাড়িতেই চলে এসেছিল। এতদিন বৃদ্ধ তাকে খাঁচাতে আটকে রেখেছিল। চড়ুই বাড়িতে ফিরে আসায় তার নিজের যেমন আনন্দ হল, তেমনি তার পরিবারের অন্য পাখিদেরও আনন্দ হল। সে তার পরিবারের পাখিদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল।

চড়ুই তার বৈঠকখানা ঘরে বসে তার মনিবের গলা শুনতে পেল। এতদিন মনিব তাকে এত আদর-যত্ন করেছে, তাই তার ডাকে চড়ুই সাড়া না দিয়ে পারল না। সে বাইরে এসে বলল, "হুজুর, এই যে আমি। আপনি আমার খোঁজে এসেছেন—আমি কৃতার্থ।"

বৃদ্ধ আনন্দে চিৎকার করে বলল, "ওগো আমার ছোট্ট পাখি, তুমি এখানে আছ। তোমার খোঁজে আমি পথে পথে ঘুরছি।"

চড়ুই বলল, "আপনি আমার খোঁজে এসেছেন, কী করে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু আপনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন, আমার ক্ষুদ্র কুটিরে আসুন।" এই বলে সে পথ দেখিয়ে বৃদ্ধকে তার ঘরে নিয়ে গেল।

চড়ুইপাখির ঘরটা ছিল বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি। কিন্তু খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চড়ুই বিনীত ভাবে বলল, "আমি গিন্নিমার অনুমতি না নিয়ে বার্লিটা খেয়ে ফেলে সত্যিই দোষ করেছি। কিন্তু আপনি ওই ঘটনায় রাগ না করে আমার খোঁজে এত দূর এসেছেন, তাতে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।" আনন্দে পাখিটার ছোট দুটো চোখে জল এসে গেল।

বৃদ্ধ হাত নেড়ে বলল, "আমি মোটেই রাগ করিনি। তোমাকে আমি সন্তানের মতো স্নেহ করি। তোমার ঠোঁট কেটে তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি তোমার গিন্নিমাকে অনেক তিরস্কার করেছি। তোমাকে খুঁজে পেয়েছি বলে আমার আনন্দের শেষ নেই।"

মনিবকে আপ্যায়ন করার জন্য চড়ুই ব্যস্ত হয়ে উঠল। সে তাকে ভাল ভাল খাবার খেতে দিল। তারপর 'চড়ুই-নাচ' নেচে সে মনিবকে আনন্দ দিল।

এমন উপাদেয় খাবার খেয়ে আর এত সুন্দর নাচ দেখে বৃদ্ধ বলল, "এত আনন্দ আমার জীবনে আর কোনওদিন আমি পাইনি।"

বৃদ্ধ আনন্দে মশগুল। ওদিকে ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আর দেরি করা যায় না। বৃদ্ধ বলল, "মাটির পৃথিবীতে এত আনন্দ, এত সুখ আছে, তা আমার জানা ছিল না। মনে হচ্ছে, আমি যেন এক স্বর্গে এসে পড়েছি। আমার বয়স যেন কুড়ি বছর কমে গেছে। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করতে পারি না। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার বাড়ি যাই।"

চড়ুই কিন্তু বৃদ্ধকে যেতে দেবে না। সে বলল, "এত তাড়া কিসের? আপনি আমার বাড়িতে দু'চার দিন থেকে যান। আপনার বাড়িতে আমাকে কত আদর, কত স্নেহ করেছেন। দু'চার দিন আপনার সেবা করলে তার শতাংশও শোধ হবে না। আপনাকে কয়েক দিন থাকতেই হবে।"

বৃদ্ধ বলল, "এত আনন্দ ছেড়ে যেতে আমার কি ইচ্ছা করে? কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে। বেশি সময় থাকার উপায় নেই আমার। তবে হ্যাঁ, যখনই সময় পাব, আমি তোমার এখানে আসব। আমাকে আজকের মতো সুন্দর সুন্দর নাচ দেখাতে হবে।"

চড়ুই বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপনি কয়েক দিন থাকবেন। তাই খুব ভাল নাচগুলো দেখাইনি। ভেবেছিলাম আস্তে-আস্তে সব নাচ দেখাব। আপনি যখন চলেই যাবেন, তখন আপনাকে আর বাধা দেব না। তবে দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।"

চড়ুই ভেতরে গিয়ে দুটো মেতের বাক্স নিয়ে এল। তারপর

বলল, "এই বাক্সদুটির একটি খুব ভারী আর একটি হাল্কা। আপনার যেটা পছন্দ হয় নিয়ে যান। এই সামান্য উপহার আপনাকে নিতেই হবে।"

"উপহার ! এত খাওয়া-দাওয়া এবং নাচ দেখার পর আবার উপহার ! কিন্তু তোমার আন্তরিকতাকে তো আমি ছোট করে দেখতে পারি না। তাই একটা বাক্স আমি অবশ্যই নেব।"

চড়ুই বলল, "ভারী বাক্সটা কি দেব ?"

"না, না। আমি বুড়ো মানুষ। ভারী বাক্সটা আমি বয়েই নিতে পারব না। হাল্কাটাই যথেষ্ট।"

চড়ুই তখন বলল, "তা হলে হাল্কাটাই নিয়ে নিন।"

বৃদ্ধ চড়ুই পাখির সহায়তায় হাল্কা বাক্সটা পিঠে নিয়ে বাড়ির গেটে এল। তাকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে চড়ুই-পরিবারের সব পাখিই সেখানে ছিল।

বৃদ্ধ বলল, "এবার চলি। তবে শিগ্গিরই আবার আমি আসব।"

চড়ুই বলল, "যত শিগ্গির সম্ভব আসবেন। অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তায় সাবধানে যাবেন।"

বৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়ে ঠুক-ঠুক করে চলতে লাগল। এত যত্ন, এত আদর সে জীবনে কোনওদিন পায়নি। বারবার সে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল।

এবার দেখা যাক বৃদ্ধের স্ত্রী বাড়িতে কী করছে। বাড়িতে বৃদ্ধার সময় কাটে না। সে সারাদিন ঘর-বার করে। এক-একবার তার ভারী ভয়ও হয় স্বামীর জন্য, বুড়ো মানুষ, কোথায় যে গেল ! শরীরটাও তার ভাল নয়। বেঘোরে না বুড়োর প্রাণটা যায়। আবার এক-একবার সেই চড়ুইটাকে গাল দেয়, "হতভাগা পাখি। দু'চোখে দেখতে পারি না ওটাকে। বুড়োটারও মাথা খারাপ হয়েছে। পাখিটাকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? ঠোঁট কেটে পাখিটাকে তাড়িয়ে দিলাম। তবু নিস্তার নেই। পাখিটার খোঁজে বেরিয়েছে বুড়ো।"

সন্ধ্যার পর বৃদ্ধা অস্থির হয়ে উঠল। সে দরজায় এসে পিদিম হাতে দাঁড়াল।

অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধা দেখল, দূরে পথের বাঁকে কে যেন আসছে। হ্যাঁ, তার স্বামীই মনে হচ্ছে। সে এগিয়ে গেল। রাস্তাতেই সে বৃদ্ধকে বকতে লাগল, "তোমার কোনও দিন আক্কেল হবে না। সারাটা দিন আমার কী করে কাটে, তা তো কোনওদিনই ভাবলে না। আজ আবার সারাটা দিন হতভাগা পাখিটার খোঁজে কাটিয়ে এলে।"

কথা বলতে বলতেই দু'জন ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। বৃদ্ধ ধপ্ করে বাক্সটা মাটিতে রেখে বলল, "বকবক কোরো না তো। পাখিটাকে অমন করে তাড়িয়ে দিলে। কী করে ওর ঠোঁটটা তুমি কাটতে পারলে, এতটুকু দয়া-মায়া তোমার নেই। কী আদর-যত্নটাই সে আমাকে করল। আবার আসার সময় একটা উপহারও দিল। দুটো বাক্স সে এনেছিল, একটা প্রচণ্ড ভারী আর একটা হাল্কা। আমাকে যে-কোনও একটা আনতে বলেছিল। আমি বুড়ো মানুষ, পথ চলাই আমার দায়। তাই হাল্কা বাক্সটাই নিয়ে এলাম। দ্যাখো তো এর মধ্যে কী আছে।"

বৃদ্ধা শুধু নিষ্ঠুরই ছিল না, সে প্রচণ্ড লোভীও ছিল। বেচারা বুড়ো এতটা পথ হেঁটে এসেছে, কোথায় তাকে একটু চা করে দেবে তা নয়, একেবারে সঙ্গে সঙ্গে সে বসে গেল বাক্সে কী আছে দেখতে। বাক্স খুলেই কিন্তু সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। সেই বাক্সতে থরে থরে সাজানো রয়েছে সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড় এবং দামি গয়না ও মণিমুক্তো।

বৃদ্ধা আনন্দে প্রায় চড়ুই-নাচ নাচতে লাগল। বৃদ্ধা বলতে লাগল, "তুমি চিরদিন বোকাই রয়ে গেলে। পাখি দিল, কোথায় ভারী বাক্সটা নিয়ে আসবে, তা নয়, এনেছ হাল্কা বাক্সটা। ওটায় নিশ্চয়ই আরও বেশি কাপড়-চোপড়, মণিমুক্তো ছিল।" তারপর নির্লজ্জের মতো বলল, "ভাগ্যিস্ পাখিটাকে তাড়িয়েছিলাম, তাই এটুকু ধন ঘরে এল।"

বৃদ্ধা আবার বলল, "তোমার বোকামির জন্য সারাটা জীবন আমাকে ভুগতে হল। জীবনে কোনওদিন একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখলাম না। হাল্কা বাক্সটা নিয়ে ধেই-ধেই করে চলে এসেছ। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আমি ওই ভারী বাক্সটা নিয়ে আসব।"

বৃদ্ধ বলল, "বেশি লোভ ভাল নয়। আমাদের কে আছে যে ধনদৌলত ভোগ করবে ? যা এনেছি তাতেই আমাদের বাকি জীবনটা রাজার হালে চলে যাবে। কোন্ লজ্জায় তুমি আবার ভারী বাক্সটা আনতে যাবে ? একটা বাক্স এনেছি,তা-ই যথেষ্ট।"

বৃদ্ধা ঝংকার দিয়ে উঠল, "তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেলেও আমার পায়নি। ধন থাকলে কি ভোগ করার লোকের অভাব হয় ?" এই বলে বৃদ্ধা গটগট করে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধের মতো বৃদ্ধাও পথ দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে—

ঠোঁট-কাটা চড়ুইপাখি, কোথায় তুমি বলো,
আমি তোমায় খুঁজে মরি, এসো এসো এসো।

ওদিকে বৃদ্ধ চলে যাওয়ার পর চড়ুই তার ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়েছিল। তার পরিবারের অন্যান্য পাখির সঙ্গে বসে সে তার পুরনো মনিবের সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। সে বলছিল, "অতিশয় সজ্জন আমার এই মনিব। আবার এলে তাঁকে আরও ভাল-ভাল খাবার খাওয়াব এবং আরও সুন্দর-সুন্দর নাচ দেখাব। এমন ভদ্রলোকের এত দজ্জাল স্ত্রী কেমন করে যে হল। এত বদমেজাজি স্ত্রীলোক সহজে দেখা যায় না। এই আমার ব্যাপারটাই দ্যাখো না, একটু বার্লি খেয়েছি আর অমনি আমার ঠোঁটটা কেটে দিল।"

পাখিরা যখন এসব আলাপ-আলোচনা করছে, তখন দরজায় ঘা পড়ল। বৃদ্ধা একটা হাঁচি দিল। (জাপানে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কেউ যখন আড়ালে নিন্দা করে তখন হাঁচি পায়।) বৃদ্ধা বুঝল, চড়ুইরা নিশ্চয়ই তার নিন্দা করছে। যাহোক সে দরজায় আবার ধাক্কা দিয়ে বলল, "এটা কি ঠোঁটকাটা চড়ুইয়ের বাড়ি ?"

দরজায় দু'বার ধাক্কা পড়ায় চড়ুই এসে দরজা খুলে দেখে তার সেই মনিবের স্ত্রী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এই মহিলাই তার ঠোঁটটা কেটে দিয়েছে। তাই তাকে দেখে চড়ুইয়ের গা রাগে জ্বলে গেল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। চড়ুই ভাবল, যা-ই হোক, আমার মনিবের স্ত্রী এবং আমার বাড়িতে এসেছে। তাই তার প্রতি কোনও অভদ্র ব্যবহার করা আমার উচিত নয়।

চড়ুই হাসিমুখে বলল, "ভেতরে আসুন।"

বৃদ্ধা বলল, "ভেতরে আর যাচ্ছি না। আমার খুব তাড়া

ত্বকের সংক্রমণ যেমনি অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর তেমনি বিচ্ছিরি

প্র্যাগমেটর কাজ করে চারভাবে, তাই সংক্রমণ দূর করে ও চটপট সারিয়ে তোলে।

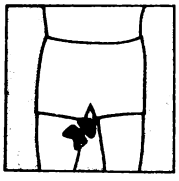

ধোবিজ ইচ্—সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে হয়। 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করে সারিয়ে তুলুন।

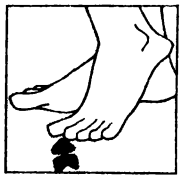

হাজা—ভেজা পায়ে হতে চায়। দ্রুত আরাম পেতে 'প্র্যাগমেটর' লাগান।

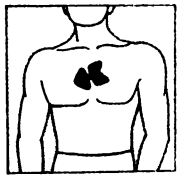

দাদ—শরীরের যে-কোনো জায়গাতেই হতে পারে। অবহেলা করবেন না—উপশমের জন্যে 'প্র্যাগমেটর' ব্যবহার করুন।

স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চললে অথবা সংক্রামিত কাপড়চোপড় থেকে এধরণের ছত্রাকজনিত ত্বকের সংক্রমণ হতে পারে—যে-কোনো সময়েই। প্র্যাগমেটর চারভাবে কাজ করে বলে এসব বালাই দূর হয়ে যায়। ডাক্তাররাও তাই প্র্যাগমেটরই ব্যবহার করতে বলেন।

তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢোকে
'প্র্যাগমেটর' তাড়াতাড়ি ত্বকে ঢুকে সংক্রামিত জায়গায় ও তার চার পাশে কাজ শুরু করে দেয়।

ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে
'প্র্যাগমেটর' সংক্রামিত ত্বক সারিয়ে দেয় এবং ভালভাবে সংক্রমণমুক্ত করে দিয়ে ত্বকের স্বাস্থ্য ফেরায়।

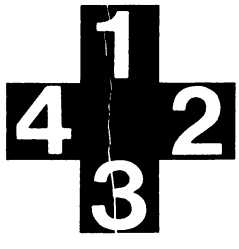

চটপট চুলকানি বন্ধ করে
'প্র্যাগমেটরে' সংক্রামিত জায়গা আঁচড়ানোর ইচ্ছেকে প্রশমিত করে তাই সংক্রমণও ছড়াতে পারে না।

ছত্রাকজনিক সংক্রামণ রোধে
'প্র্যাগমেটরে' আছে সুপরিচিত ও কার্যকর ছত্রাক-প্রতিরোধী জিনিষ গন্ধক যা গুঁড়ো আকারে থাকায় সংক্রামিত জায়গায় আরো ভালভাবে লাগে।

আয়োডেক্স নির্মাতাদের তৈরি

1148 BEN

PRAGMATAR
Ointment of Cetyl Alcohol, Cetyl Tar Distillate, Sulphur and Salicylic Acid 28g

'প্র্যাগমেটর' মানেই হাতের কাছে দ্রুত আরাম

SKF —AN ESKAYEF PRODUCT © Eskayef Limited

আছে আমি এক্ষুনি চলে যাব।"

চড়ুই বলল, "এতটা জায়গা হেঁটে এসেছেন। ঘরে এসে একটু বিশ্রাম করুন।"

বৃদ্ধা বাধা দিয়ে বলল, "আমি চলে যাব। খাওয়া-দাওয়া বা নাচগানের আসর বসানোর দরকার নেই। অবশ্য উপহার যা দেবে আমি নিয়ে যাব।"

চড়ুই বলল, "নিশ্চয় আপনাকে একটা কিছু উপহার দেব। দু' বাক্স উপহার ছিল। মনিব হাল্কা বাক্সটা নিয়ে গিয়েছেন। শুধু ভারী বাক্সটা পড়ে আছে।"

বৃদ্ধা বলল, "কোনও চিন্তা কোরো না। তোমার মনিবের চেয়ে আমার বয়স অনেক কম। তাই অনায়াসে আমি ভারী বাক্সটা বয়ে নিতে পারব। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি করো বাপু। রাত বেড়ে যাচ্ছে।"

চড়ুই ভেতরে গিয়ে একটা বেতের বাক্স নিয়ে এল।

বৃদ্ধা প্রায় ছুটে গিয়ে বাক্সটা পিঠে তুলে নিল এবং চলতে চলতে বলল, "বড্ড তাড়া আছে আমার। যাচ্ছি, ধন্যবাদ।"

বৃদ্ধা বাক্সটা নিয়ে যাচ্ছে আর ভাবছে এটা আগের বাক্সটার চেয়ে বহুগুণ ভারী মনে হচ্ছে। হবেই তো, এতে যে বহুগুণ বেশি ধনরত্ন আছে।

বাক্সটা যেন ক্রমশ আরো ভারী হয়ে উঠছে। এত শীতের মধ্যেও বৃদ্ধা ঘেমে উঠল। কিন্তু তার মনে ভারী স্ফূর্তি। বাক্সটার মধ্যে কী পরিমাণে মণিমুক্তো থাকতে পারে।

ভারটা শেষে অসহ্য হয়ে উঠল। আর চলতে পারছে না বৃদ্ধা। তা ছাড়া এই বাক্সটার মধ্যে কী আছে দেখার জন্য তার কৌতূহলও বাড়তে লাগল।

বৃদ্ধা রাস্তার পাশে বাক্সটা রাখল এবং ভেতরে কী আছে দেখার জন্য ঢাকনাটা সরাল। কিন্তু তারপর ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বাক্সটার মধ্যে বসে আছে একটা তিন-চক্ষু দানব, একটা বিশাল ব্যাঙ, একটা বিষাক্ত সাপ, নানা রকমের কুৎসিত সরীসৃপ এবং অনেক-নোংরা পোকামাকড়।

বৃদ্ধা ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে মাটিতে পড়ে "বাঁচাও বাঁচাও" বলে চেঁচাতে লাগল। তার চিৎকারে সেই ভয়ঙ্কর জীবগুলো বাক্স থেকে মাথা বের করে তাকাতে লাগল। প্রথমে সাপটা বেরিয়ে এসে বৃদ্ধার দেহটা জড়িয়ে ফেলল। তারপর ব্যাঙটা এসে তার লম্বা জিভ দিয়ে বৃদ্ধার গাল-মুখ চাটতে লাগল।

বৃদ্ধার দেহে প্রচণ্ড শক্তি ছিল। সে বহু চেষ্টা করে সাপের বাঁধন আলগা করে ফেলল। তারপর সে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল।

বৃদ্ধ বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বৃদ্ধাকে এমনভাবে ছুটে আসতে দেখে সে এগিয়ে এল। বৃদ্ধা তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বাড়িতে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে যা ঘটেছে তাই বলল।

সব শুনে বৃদ্ধ একটু চিন্তা করে বলল, "আগেই তোমাকে বলেছিলাম, বেশি লোভ ভাল নয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। যাহোক, প্রাণটা নিয়ে যে ফিরে এসেছ, তা-ই ভাল।"

স্বামীর কথার অর্থ বুঝল বৃদ্ধা। সেদিন থেকে সে একেবারে পালটে গেল এবং স্বামীর মতো সে-ও সৎ ও দয়ালু হয়ে উঠল।

ছবি : প্রবীর সেন

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে একটা উটকো লোক জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি উদ্ভট-বিজ্ঞানী শিবুবাবুর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে, আর-এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে এক মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে চান। সন্দিগ্ধ দুই ভাই পালিয়ে যে-বাসে ওঠে, তাতে খুন হয় মহারাজার সেক্রেটারি। গজ-পালোয়ানের ডেরাতেও একটা জখম লোক ঢুকে মারা গিয়েছিল। কিন্তু তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। উটকো লোকটার নাম আপাতত পঞ্চানন্দ। মধ্যরাতে তিনটে মূর্তি শিবুবাবুর ল্যাবরেটরির দিকে এগোয়। পঞ্চানন্দ ন্যাড়াকে বলে, তারা গজ-পালোয়ানকে ধরে নিয়ে গেছে। হরিবাবুর বাজারের ভার ইতিমধ্যে পঞ্চানন্দ নিয়েছে। তারপর···

পঞ্চানন্দ যখন বাজার করে ঘুরে এল তখনও হরিবাবু মাঠের ধারে বাঁধানো গাছতলায় বসে খুব কষে ভাবছেন, কবিতা লেখা ঘুড়ি ক'ডজন ছাপানো যায় এবং কবিতার ঠোঙা তিনি কীরকম কাগজ দিয়ে তৈরি করাবেন। ভাবতে-ভাবতে তন্ময় হয়ে গেছেন। একটা নেড়ি কুকুর এসে তাঁর গা শুঁকে অনেকক্ষণ ল্যাজ নাড়ল, তারপর তাঁর একপাটি চটি মুখে নিয়ে চলে গেল। তিনি টেরও পেলেন না।

পঞ্চানন্দ এসে এই অবস্থা দেখে প্রথমে গলাখাঁকারি দিল। তাতে কাজ না হওয়ায় দু'বার "হরিবাবু, ও হরিবাবু" বলে ডাকল। এবং অপারগ হয়ে শেষে ধাক্কা দিয়ে হরিবাবুকে সচেতন করে বলল, "বাজার হয়ে গেছে। একেবারে কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব মিলিয়ে এনেছি। গিন্নিমা'র ফর্দের মধ্যে দামটাও টুকে দিয়েছি।"

হরিবাবু এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে গা করলেন না। এমনই তাঁর অন্যমনস্কতা যে, উঠে একপাটি চটি পায়ে দিয়ে আর একপাটির জন্য পা বাড়িয়ে যখন সেটা পেলেন না, তখনও তাঁর তেমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হল না। মনে হল, একপাটি চটি পায়ে দেওয়াই তো রেওয়াজ। সুতরাং একটা খালি পা আর একটা চটি-পায়ে পঞ্চানন্দের পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি বললেন, "দ্যাখো পঞ্চানন্দ, ঠোঙা ঘুড়ি এসব ভাল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা ব্যাপারও আমার মাথায় এসেছে। ধরো, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের যদি বিনা পয়সায় খাতা বিলোনো যায়, আর সেই খাতার মলাটের চার পিঠে চারটে কবিতা ছাপিয়ে দিই তো কাজটা অনেক দূর এগোয়। বছরের শুরুতে আমরা কবিতা-ছাপানো ক্যালেণ্ডার বের করতে পারি। তারপর হোমিওপ্যাথ ডাক্তারদের ধরে পড়লে তারা যে পুরিয়া করে ওষুধ দেয় সেই পুরিয়ার কাগজে ছোট-ছোট কবিতা ছাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

পঞ্চানন্দ বলল, "খাসা হবে। ওষুধের উপকার, কবিতার উপকার, দুই একসঙ্গে। এরকম আরও ভাবতে থাকুন। আমাদের হরিদাস কবিয়াল তো দিনে পাঁচ-সাতখানা করে খাম পোস্টকার্ড পাঠাত নানা লোককে।"

হরিবাবু হতচকিত হয়ে বললেন, "খাম পোস্টকার্ড ?"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলল, "বুঝলেন না, সে কি আর সত্যিকারের চিঠি নাকি ? সব কবিতায় ঠাসা। চিঠি ভেবে লোকে খুলে দেখত কবিতা। ওইভাবেই তো হরিদাস একেবারে ঝড় তুলে দিয়েছিল।"

হরিবাবু উত্তেজিত গলায় বললেন, "তুমি আজই কয়েকশো খাম আর পোস্টকার্ড নিয়ে এসো।"

পঞ্চানন্দ উদার গলায় বলল, "হবে হবে, সব হবে। পঞ্চানন্দ যখন এসে পড়েছে তখন আর আপনার ভাবনা কী ? কিন্তু হরিবাবু, আপনার ডান পায়ের চটিটা যেন দেখছি না !"

হরিবাবুও তাকিয়ে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তেমন অবাকও হলেন না। বললেন, "চটি জিনিসটাই বাজে। কখনও একটা পাই না, কখনও দুটোই পাই না।" বলে বাঁ পায়ের চটিটা ছুঁড়ে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে খালি পায়ে ডগমগ হয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "আচ্ছা, ধরো, যদি কবিতা দিয়ে নামাবলী ছাপিয়ে বিলি করি, তা হলে কেমন হয় ?"

"ভেবে দেখার মতো কথা বলেছেন। খুবই ভেবে দেখার মতো কথা। তবে কিনা গিন্নিমা দোতলা থেকে এদিকে নজর রেখেছেন। বাজারের থলিটা এইবেলা হাতে নিয়ে ফেলুন। আমি বরং পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি।"

তা সত্যিই হরিবাবুর স্ত্রী দোতলা থেকে নজর রাখছিলেন। হরিবাবু বাড়ি ঢুকতেই তিনি ধেয়ে এসে তাঁর সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন।

হরিবাবু পকেট থেকে ফর্দটা পট করে বের করে এনে একগাল হেসে বললেন, "আজ দ্যাখো, হিসেব একেবারে টু দি পাই মিলিয়ে এনেছি।"

তাঁর গিন্নি কঠোর গলায় বললেন, "হিসেব পরে হবে, আগে বলো, পায়ের চটি-জোড়া কোথায় জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছ !"

হরিবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "চটি ! চটি পরে আমি বাজারে যাইনি তো।"

"চটি পরে যাওনি মানে ? তবে কি বুট পরে গিয়েছিলে?"

দু'দিন পঞ্চানন্দের সঙ্গে মিশে হরিবাবুর বুদ্ধি বেশ খুলে গেছে। একগাল হেসে বললেন, "আরে না। খালি পায়েই গিয়েছিলাম। আজকাল ডাক্তারদের মত হচ্ছে, যত আর্থ কন্টাক্ট হয় ততই ভাল। তাতে চোখের জ্যোতি বাড়ে, ব্লাডপ্রেশার হয় না, মাথায় নানারকম ভাব খেলে।"

তাঁর গিন্নি কথাটা বিশ্বাস করলেন না বটে, কিন্তু বেশি ঝামেলাও করলেন না। অফিসের সময় হয়ে আসছে। রান্নায় এ সময় কিছু তাড়া থাকে। শুধু বললেন, "আচ্ছা এ নিয়ে পরে বোঝাপড়া হবে।"

হরিবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জামা ছেড়ে ছাদে উঠে

রোদে বসে তেল মাখতে লাগলেন গায়ে। মাখতে-মাখতে তাঁর ভাব এল। তেলমাখা গায়েই তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে টেবিলে বসে খাতা আর কলম টেনে নিলেন। লিখলেন :

পৃথিবীর গূঢ় অর্থ রয়েছে গোপন,
তেল যথা বুকে সরিষার।
ঘানির গোপন রন্ধ্রে তীব্র নিষ্পেষণে
শুরু হয় তার অভিসার।
কবির হৃদয় আজ ঘানিগাছ হয়ে
নিষ্পেষণ করে পৃথিবীরে,
সত্যের অমল মুখ আজি এ কবিরে
দেখা দিবি কি রে ?

ওদিকে পঞ্চানন্দ বাড়ির পিছন দিকে একটু আড়ালে পড়েই হন্‌হন্‌ করে হাঁটা দিল। বড় রাস্তা বা লোক-চলাচলের জায়গাগুলো সাবধানে এড়িয়ে সে একটু ঘুরপথেই শহরের বাইরে এসে পড়ল দেখতে-না-দেখতেই। তারপর একটু পতিত জমি আর একটা মজা পুকুর পার হয়ে জঙ্গুলে রাস্তা ভেঙে এসে উঠল চকসাহেবের বাড়ির হাতায়।

বাইরে থেকে খুব ভাল করে বাড়িটা আর তার আশপাশ দেখে নিল সে। কোথাও কোনও নড়াচড়া নজরে পড়ল না। আগাছায় ভরা বাগানের মাঝখানে ভাঙা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ধারেকাছে জনবসতি নেই।

পঞ্চানন্দ সাবধানে ভিতরে ঢুকল এবং ঝোপঝাড়ের আড়ালে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে এগোতে লাগল।

দিনের বেলায় ভাঙা বাড়িটাকে যেমন করুণ দেখাচ্ছে, রাতের বেলায় তেমনি ভয়াবহ মনে হবে। এসব বাড়িতে সাপ আর ভূত গিজগিজ করে।

পঞ্চানন্দ চোর-পায়ে বারান্দাটা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। না, গজ-পালোয়ানের ঘরে কেউ নেই। জিনিসপত্রগুলো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে বটে। কেউ কিছু একটা খুব খুঁজেছে। কী খুঁজেছে সেটাই জানা দরকার।

পঞ্চানন্দ ভিতরে ঢুকে চারপাশটা পাঁতি-পাঁতি করে দেখল। তার চোখে তেমন কিছু সূত্র নজরে পড়ল না।

দরজার কাছে মেঝের ওপরটা খুব ভাল করে দেখল পঞ্চানন্দ। মেঝেতে লালমতো দাগ রয়েছে খানিকটা। কিন্তু পঞ্চানন্দ চোখ বুজে বলে দিতে পারে ওটা কিছুতেই রক্তের দাগ নয়। রক্ত হলে এতক্ষণ মাছি ভ্যানভ্যান করত। জায়গাটা লাল না হয়ে কালচে দেখাত।

পঞ্চানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরের দরজা দিয়ে সাবধানে ভাঙা বাড়ির ভিতরে ঢুকল। দেখার মতো তেমন কিছু নেই। রাশি-রাশি ইঁটের স্তূপ, কড়ি-বরগা হেলে পড়ে আছে, থাম পড়ে আছে মেঝের ওপর, আগাছা জমেছে এখানে-সেখানে।

পঞ্চানন্দ একটার পর একটা ঘর পার হতে লাগল।

পশ্চিম দিকে যে হলঘরটা রয়েছে সেটা ততটা ভাঙা নয়। তবে চারদিক থেকে ইঁট বালি এবং আরও সব ধ্বংসস্তূপ পড়ে ঘরটা একেবারে দুর্গম জায়গা হয়ে গেছে।

পঞ্চানন্দ খুঁজে-খুঁজে একটা জায়গায় একটা রন্ধ্র বের করে ফেলল। উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরটা ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তবু অনেকক্ষণ চোখ রাখল সে ভিতরে।

একটা ইঁদুর বা ছুঁচো যেন ডাকল ভিতরে। চিঁ-চিক-চিক।

পঞ্চানন্দ হতাশ হয়ে সরে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ তার একটা খটকা লাগল। ইঁদুর বা ছুঁচোর ডাক সে জীবনে অনেক শুনেছে। এ-ডাকটা অনেকটা সেরকম হলেও হুবহু একরকম নয়। একটু যেন তফাত আছে।

পঞ্চানন্দ ফুটোটায় কান পাতল। এবার আর ছুঁচো বা ইঁদুরের ডাক বলে ভুল হল না। স্পষ্টই একটা যান্ত্রিক আওয়াজ। একটা কোনও সংকেত।

ফুটোর মধ্যে একটা দেশলাইকাঠির আগুন ধরলে ভিতরটা দেখা যেতে পারে মনে করে পঞ্চানন্দ ফুটোতে কান রেখেই দেশলাইয়ের জন্য জামার পকেট হাতড়াতে লাগল।

ঠিক এ-সময়ে খুব মোলায়েম হাতে কে যেন তার কানটা একটু মলে দিয়ে বলে উঠল, "এখানে কী হচ্ছে ?"

আঁতকে উঠে পঞ্চানন্দ এমন একটা লাফ মেরেছিল যে, আর একটু হলেই হাইজাম্পের বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ফেলত। লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে পঞ্চানন্দ মিটিমিটি চোখে চেয়ে দেখল, পাঁচ-সাতজন ছেলেছোকরা দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

পঞ্চানন্দ বুদ্ধি হারাল না। একগাল হেসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এই একটু দেখছিলাম আর কি !"

একটা কেঁদো চেহারার ছোকরা ধমক দিয়ে বলল, "এখানে দেখার আছেটা কী ?"

পঞ্চানন্দ নির্বিকারভাবে বলল, "শুনেছিলাম বাড়িটা বিক্রি হবে। তাই অবস্থাটা একটু নিজের চোখে দেখে গেলাম আর কি। এ-অঞ্চলে একটা বাড়ি কেনার ইচ্ছে অনেক দিনের।"

কেঁদোটা এক পা এগিয়ে এসে গমগমে গলায় বলল, "আর এদিকে গজদার ঘরে জিনিসপত্র হাটকে-মাটকে রেখেছে কে ?"

"আজ্ঞে, আমি না। গজ'র সঙ্গে দেখা করতেই আসা। সে আমার সম্পর্কে মাসতুতো ভাই হয়। গজ কোথায় গেছে তা আপনারা বলতে পারেন ?"

ছেলেগুলো একটু মুখ-চাওয়াচায়ি করল। তারপর কেঁদোটা একটু হটে গিয়ে বলল, "আমরা গজদার কাছে কুস্তি শিখি। কিন্তু গজদাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। আমরাও তাকে খুঁজছি।"

পঞ্চানন্দ খুব চিন্তিতভাবে বলল, "তা হলে তো বেশ মুশকিলই হল। গজ'র চিঠি পেয়েই আসা। সে-ই এ বাড়ির খবর দিয়েছিল কিনা।"

একটা ছেলে বলল, "আপনি কি সোজা স্টেশন থেকে আসছেন ? তা হলে আপনার বাক্সটাক্স কোথায় ?"

পঞ্চানন্দ খুব অমায়িক হেসে বলল, "গজ'র কাছে এসে উঠব, এমন আহাম্মক আমি নই। আমি উঠেছি ন্যাড়াদের বাড়িতে। ন্যাড়াকে বোধহয় আপনারা চেনেনও।"

"ন্যাড়া !" বলে সকলে আবার মুখ-চাওয়াচায়ি করে।

"আজ্ঞে। আমি হলুম গে হরিবাবুর ম্যানেজার। তাঁর বাবার আমল থেকেই যাতায়াত। মাঝখানে কয়েকটা বছর হিমালয়ে তপস্যা করতে যাওয়ায় সম্পর্কটা একটু ঢিলে হয়ে গিয়েছিল।"

সকলে বেশ সম্ভ্রমের চোখে পঞ্চানন্দের দিকে তাকায়। কেঁদো বলে, "তা দাদার নামটা কী ?"

"পঞ্চানন্দ। ওটি সাধনমার্গের নাম। ওতেই ডাকবেন।"

"আমাদের মাপ করে দেবেন। খুব অন্যায় হয়ে গেছে।"

পঞ্চানন্দ উদার গলায় বলল, "করলাম।" (ক্রমশ)

Amela—6 (4.9.85)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

লন্ডনের রিজেন্ট'স পার্ক চিড়িয়াখানায় ...

কী হে পশুরাজ, অত রাগ কেন ? এবারে তোমাকে পোষ মানিয়ে ছাড়ব !

রজারের একটা হাত চিবিয়ে দিয়েছে !

সাবধান, আলফ !

রিজেন্ট'স পার্ক চিড়িয়াখানা

পার্লামেন্টের লর্ডস-সভায় টারজান ওরফে জন ক্লেটন ওরফে সপ্তম লর্ড গ্রেস্টোক আজ বক্তৃতা করবেন । অধিকাংশ সদস্যই তাঁর অরণ্য-জীবনের কথা জানেন না ।

বানর মেরে গবেষণা চালানোকে নিষিদ্ধ করে যে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রস্তাব উঠেছে, ব্রিটেনের তাতে অবশ্যই সম্মত হওয়া উচিত । এই গবেষণা অত্যন্ত নিষ্ঠুর । মানবহিতের জন্য হলেও আমি বলব, অমানবিক !

টারজানের বন্ধু বানিও (লর্ড টেনিংটন) তাঁকে শান্ত করতে পারছেন না ...

সবাই হাসছে তো কী হয়েছে ? যেও না !

প্রাণী-হত্যা বন্ধ করার প্রস্তাব হাসির ব্যাপার ? ছিঃ !

পার্লামেন্টের বাইরে অপেক্ষায় আছেন দুজনের স্ত্রী, জেন ও ভ্যাজেল ...

পার্লামেন্টে এই তোমার দ্বিতীয় বক্তৃতা । অত রেগে গেলে চলে ?

প্রথম বক্তৃতাটাও ছিল মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডের !

তুমি জানো, আমি বক্তা নই ।

চলি, বানি ।

আবার দেখা হবে ।

অরণ্যে না-ফিরে ওঁর শান্তি নেই ।

ওদিকে ... চিড়িয়াখানায় ...

সিংহটা নরখাদক ! পালাও !

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অর্থ জানো

মটকি…তিজেল…

আজকাল রান্নাঘরে ফ্রিজ, প্রেশার কুকার, গ্যাস ওভেন ইত্যাদি আসার ফলে আমাদের পুরনো দিনের হাঁড়িকুড়ির সঙ্গে আর আগের মতো তেমন পরিচয় নেই। যে-সব বাসন-কোসনের নাম এখানে দেওয়া হল, তাদের নাম তোমরা শুনেছ, গল্প-উপন্যাসে তাদের উল্লেখও পেয়েছ। নীচে ওই শ্রেণীর প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

(১) **মটকি**— (ক) বাসন রাখবার উঁচু তাক। (খ) মাটির কানা-খাড়া কলসি। (গ) মাটির বড় রেকাবি। (ঘ) মাটির কানা-হেলানো হাঁড়ি।

(২) **তিজেল**—(ক) মাটির বড় কলসি। (খ) রাঁধা জিনিস রাখবার মাটির পাত্র। (গ) মাটির তৈরি ছোট ঘড়া। (ঘ) ডাল-ঝোল রাঁধবার চ্যাপ্টা মাটির হাঁড়ি।

(৩) **নাগরি**— (ক) বিশেষ ধরনের ছোট কলস। (খ) বড় গামলা। (গ) মাটির বড় হাঁড়ি। (ঘ) মাটির তৈরি ছোট ঘটি।

(৪) **পরাত**—(ক) পিতলের বড় বাটি। (খ) রাঁধা খাবার ঢাকবার বস্ত্র। (গ) ছোট মাপের পিতলের থালা। (ঘ) পিতলের কানা-উঁচু বড় থালা।

(৫) **বারকোশ**— (ক) কাঁসার বড় থালা। (খ) কাঠের কানা-উঁচু বড় থালা। (গ) পিতলের বড় থালা। (ঘ) কাঠের বাটি।

উত্তর : ১। মটকি—(খ) মাটির কানা-খাড়া কলসি। সাধারণত ঘি রাখবার জন্য মটকির ব্যবহার ছিল। যেমন, 'আনবে কটকি জুতো, মটকিতে ঘি এনো' (রবীন্দ্রনাথ)।

২। তিজেল— (ঘ) ডাল-ঝোল রাঁধবার চ্যাপ্টা মাটির হাঁড়ি। শব্দটির মূলে আছে পর্তুগিজ শব্দ tigela।

৩। নাগরি— (ক) বিশেষ ধরনের ছোট কলস। সাধারণত গুড় রাখবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, গোরুর গাড়ি গুড়ের নাগরিতে বোঝাই।

৪। পরাত— (ঘ) পিতলের কানা-উঁচু বড় থালা। সাধারণত পরিবেশনের জন্য এতে ভাত রাখা হয়।

৫। বারকোশ— (খ) কাঠের কানা-উঁচু বড় থালা। ফার্সি 'বারকশ' শব্দ থেকে এসেছে। এই থালা যথেষ্ট চওড়া ও গোল। যেমন, 'বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফ্‌তা পোলাও' (মুজতবা আলি)।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

বাবা হাসপাতালে

চামেলি আর চম্বল মা'র সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিল, বাবাকে দেখতে। শরীরটা হঠাৎ খারাপ হওয়াতে গতকাল বাবা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

At dinner that night Chameli asked her mother, "When will Daddy come home from hospital, Mummy?"

Mrs. Roy said, "It won't be long now, Milly. Now that he's in hospital, he'll get well quickly."

Chameli was silent for a moment and then said she hated hospitals. "I'm sure Daddy hates it there, too," she added.

Mrs. Roy said, "You're quite wrong to hate hospitals, Milly. A hospital is the place where the sick get well. Do you hate hospitals because you see only the sick and the suffering there? But you must think that at the hospital they're trying to make them well. The wise don't hate such a place. It's doing nothing but good. And then, think of this. When a rich man falls ill, he can get all the treatment he needs at home. But the poor have to go to hospitals. Think what a blessing it is to them. Hate hospitals? When I enter one, I get the feeling that I'm in a holy place."

ইংরেজিতে প্রায়ই দেখা যায়, এক ধরনের পদ অন্য ধরনের পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহার করা হয়, যেমন বিশেষ্য হিসেবে বিশেষণের ব্যবহার, ক্রিয়া হিসেবে বিশেষ্যর ব্যবহার ইত্যাদি। যত দিন যাচ্ছে, এই রীতিটা বেড়েই যাচ্ছে। এবারে এমন কতকগুলো বাক্য ওপরে দেখলে, যেখানে বিশেষণ-পদ ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ্য-পদ হিসেবে। অর্থাৎ,

Adjectives used as nouns:

sick, wise, poor.

A hospital is the place where the sick get well.

The wise don't hate such a place.

The poor have to go to hospitals.

একটা জিনিস বিশেষ করে খেয়াল রাখবে। এ-ক্ষেত্রে সেই শব্দটিকে বহুবচন বলে ধরা হয়, একবচন কক্ষনো নয়, যদিও তার রূপটা একবচনের মতো। ক্রিয়াপদগুলো লক্ষ করলেই তা বুঝতে পারবে।

প্রসাদ

মহাকালের পায়ের ছাপ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বেরেসোভকা নদীর ধারে যে হাতি পাওয়া গিয়েছিল, খুব বেশি হলে তা হাজার কয়েক বছর আগেকার। কিন্তু এমন নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার কাছে এসব তো শিশু। একটা কথা বলা হয়নি। পাথর ছাড়াও আরেক রকমের ফসিল আছে। স্ফটিকের ভেতর পাওয়া গেছে এমন এমন ফসিল, যা শুধু হাজার নয়, লক্ষ নয়—কোটি-কোটি বছর আগেকার।

পাইন গাছের গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়ে এক রকমের নরম আঠা। তাকে বলে রজন। পোকামাকড়েরা এই আঠায় আট্‌কে যায়। তারপর লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে সেই রজন শুকিয়ে গিয়ে স্বচ্ছ স্ফটিকে পরিণত হয়। তার ভেতর পোকামাকড়েরা থেকে যায় অবিকল এক রকম। তাদের সূক্ষ্ম পাখা আর গায়ের লোমগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। এমন কী, শরীরের যেসব অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ছাড়া দেখা যায় না, সে-সবও একেবারে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

আর যেসব ফসিল, তার অধিকাংশই হল উদ্ভিদ আর প্রাণীদের শিলীভূত আর প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ।

ইংলিশ প্রণালীর ধারে ডোভারের আছে এক সাদা খড়ির পাহাড়। খালি চোখে দেখা যায় না এমন শতসহস্র কোটি এককোষী প্রাণীর ফসিল স্তূপাকারে জমে-জমে তৈরি হয়েছে এই পাহাড়।

সাধারণত হাড় বা শক্ত খোলসগুলোকেই ফসিল হয়ে টিঁকে যেতে দেখা যায়। কিন্তু মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে।

সমুদ্রে জেলির মতো নরম টলটলে এক রকমের মাছ আছে। বালির নীচে তারা চাপা পড়ার পর সেই বালি এক সময়ে যখন শক্ত পাথর হয়, তখন তার গায়ে ফুটে ওঠে জেলিমাছের পুরো ছাপ।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যে ল্যাটিমেরিয়া মাছ ধরা পড়েছিল, জাদুঘরে তা বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু পাথরের বুকে পাওয়া গিয়েছিল তার চেয়েও ঢের পুরনো আমলের মাছের ফসিল।

মানুষের চেয়েও প্রকৃতির সংরক্ষণের ব্যবস্থা যে কত ভাল, হাতেকলমে তার প্রমাণ পেয়েছিলেন সুইডেনের এক বৈজ্ঞানিক। ডক্টর স্টেন্সিও। এক ফসিলের খুলিতে ছুরি চালিয়ে তার মগজের দশ-জোড়া স্নায়ু অক্ষত অবস্থায় তিনি খুঁজে বার করেছিলেন।

লক্ষ-লক্ষ বছর আগে ভিজে বালিতে পড়া মহাকালের পায়ের ছাপ পাষাণের বুকে এমনিভাবে আজও জেগে রয়েছে।

স্ফটিকের মধ্যে তিন কোটি বছর ধরে একেবারে অবিকল অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছে এই পতঙ্গটি

এবার দেখুন কেয়ো-কার্পিন চুল!

এ' চুল আপনি
খুলেই রাখুন,
বিনুনী বাঁধুন,
খোঁপাই করুন, বা
যা খুশী তাই করুন

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

Dey's যাদের যত্নই আপনার আস্থা

এবার আর আধুনিক সাজে সাজতে হলে মাথায় তেল মাখা বন্ধ করতে হবে না।

কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল আপনার চুলের পুষ্টি যোগায় অথচ মাথায় তেলমাখা চটচটে ভাব আনে না। এবার আপনি আপনার সুন্দর পরিপাটি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল নিয়ে যা খুশী তাই করুন–বিনুনী বাঁধুন, খোঁপা করুন বা হালফ্যাশন মাফিক চুল খোলাই রাখুন–আপনাকে সমান ভালো দেখাবে। আর কেয়ো-কার্পিনের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আপনাকে সারাদিন সতেজ রাখবে।

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়।

CLARION C-DMHO-1

সম্পূর্ণ উপন্যাস

আমহার্স্ট স্ট্রিটে অ্যাডভেঞ্চার

বাসুকি বর্মা

মেজদিদির বাড়ি থেকে সোমনাথ যখন উঠল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। মেজদিদির বাড়ি চাঁপাতলায়। সোমনাথ থাকে বিডন স্ট্রিটের কাছে। মেজজামাইবাবু ড্রাইভার হরি সিংকে গাড়ি বের করতে বলেছিলেন সোমনাথকে পৌঁছে দেবার জন্যে। সোমনাথ রাজি হয়নি।

"এখন খানিকটা হাঁটাহাঁটি না করলে হজম হবে না। মুরগিগুলো কাল সকালে পেটের মধ্যে কোঁকর কোঁ করে ডেকে উঠবে।"

সোমনাথ হাসতে-হাসতে উঠে পড়ল। মেজদিদির বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে খাওয়াটা বেশ ভালরকমই হয়েছে।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে পা দিয়ে সোমনাথ একসঙ্গে দুটো জিনিস টের পেল। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বোঝা যাচ্ছিল না, শীতটা বেশ জোর পড়েছে। উত্তরে হাওয়ার দাপটে শরীরের হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর রবিবার বলেই হোক বা শীতের জন্যেই হোক, রাস্তায় যানবাহন আর লোক-চলাচল দুই-ই কম। সোমনাথ খুশি হল। কলকাতার ফাঁকা রাস্তা, যা সচরাচর দেখা যায় না, তার খুব ভাল লাগে। প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে সোমনাথ হাঁটতে লাগল।

যখন বিবেকানন্দ রোডের কাছে চলে এসেছে, সোমনাথ টের পেল পিছন দিক থেকে কে যেন দৌড়ে আসছে। এত রাত্রে এভাবে কে রাস্তায় দৌড়চ্ছে? সোমনাথের কৌতূহল হল। ব্যাপারটা জানবার জন্যে সে চলার গতি কমিয়ে দিল,

কিন্তু সতর্ক রইল। পিছন থেকে কেউ যাতে তাকে আচমকা আক্রমণ করতে না পারে। তখনই তার মনে হল এ আশঙ্কা অমূলক। কেননা কোনও গুণ্ডা-বদমাইশ নিশ্চয়ই এমন জানান দিয়ে তাকে আক্রমণ করবে না। আর তা ছাড়া এটা খুব বনেদি ভদ্র পাড়া। এখানে রাস্তায় গুণ্ডামি রাহাজানি হয় না। তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে রাস্তার একটা আলো থেকে একটু দূরে সোমনাথ সিগারেট ধরাবার ছুতো করে দাঁড়াল। পায়ের শব্দটা যখন তার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন সোমনাথ স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল। রাস্তার আলোটা ছুটন্ত লোকটার মুখের ওপর পড়েছে। সোমনাথ দেখল একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক হাঁফাতে-হাঁফাতে দৌড়চ্ছে। ভয়ে তার মুখটা অস্বাভাবিক রকম সাদা হয়ে গেছে। সোমনাথকে দেখে ছেলেটি থমকে গেল।

"আপনি···আপনি···আমাকে বাঁচান," ছেলেটি দম নিতে নিতে বলল, "আমাকে গুণ্ডারা তাড়া করেছে।"

"এখানে গুণ্ডা!" সোমনাথের কথায় অবিশ্বাসের ভাবটা যুবকটির কান এড়াল না।

"ঐ যে।"

সোমনাথ তাকাল। ধোঁয়াশার জন্যে সে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও শুনতে পেল আরও কেউ যেন ছুটে আসছে।

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে যুবকটির হাত ধরে টানতে-টানতে সোমনাথ বলল, "আসুন আমরাও দৌড় দিই।"

"আমি আর দৌড়তে পারছি না," যুবকটি কাতরভাবে বলল, "আমার কাছে এই জিনিসটা আছে, এটার জন্যেই ওরা আমার পিছনে ধাওয়া করেছে। এটা আপনি রাখুন। কাল সন্ধে সাতটার সময় কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের মেন গেটে এটা আমাকে দিয়ে দেবেন।"

সোমনাথ কোনও কিছু বলবার আগেই যুবকটি একটি ডায়েরি আকারের বস্তু তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ রোডের ডান দিকে দৌড়ল। সোমনাথ ডান বা বাঁদিক যে-কোনও দিক দিয়েই যেতে পারে। সে বাঁ দিকে বেঁকল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাত্র ছ ইঞ্চি দূর দিয়ে একটা পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেল। সোমনাথ জোরে দৌড়তে লাগল। খানিকটা গিয়েই বাঁদিকে একটা গলি। সোমনাথ বাড়ির দিকে না গিয়ে গলিতে ঢুকল। গলির প্রায় মুখেই নব পালের ব্যাটারির দোকান। সোমনাথ জানে নব দিনরাত্রি দোকানেই থাকে। সোমনাথ নবর দোকানের কোলাপসিব্‌লে ধাক্কা দিতেই নব বললে, "কী ব্যাপার?"

"দরজা খোলো।"

সেই যুবকের আর তার কাছ থেকে পাওয়া মোড়কটার কথা বাদ দিয়ে সোমনাথ নবকে সব ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলল।

"কেন যে গুণ্ডা বদমায়েশদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন," নব অনুযোগের সুরে বলল, "আপনার শত্রুর সংখ্যা কি কম।"

সোমনাথ কিছু না বলে হাসল। মিনিট পনেরো পরে সোমনাথ নবকে বলল, "শুয়ে পড়ো, আমি উঠি।"

"সে কী! কোথা যাবেন?"

"বাড়ি যাব না?"

"দাঁড়ান, গাড়িটা বের করি।"

নব সোমনাথের কোনও আপত্তি শুনল না। তার সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মোটর বাইকটা বের করল। সোমনাথ জানে যে, তার কোনও বিপদ নেই। কেননা লোকগুলো তাকে তাড়া করে এসে যদি বড় রাস্তায় অপেক্ষাও করে, তাদের ভুল বুঝতে পারলে তারা সরে পড়বে। তবুও নবর পেড়াপীড়িতে তাকে মোটর বাইকে চাপতেই হল।

বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে সোমনাথ প্যাকেটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। প্রথমে সে যেটাকে ডায়েরি বলে মনে করেছিল সেটা আসলে একটা সাধারণ পেস্টবোর্ডের বাক্স। বাক্সটার কোনও কোনও অংশ আঙুলের সামান্য চাপে বসে গেল। আবার কোনও জায়গা বেশ শক্ত। কী আছে ভেতরে? সোমনাথ প্যাকেটটা তার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে চাবি দিয়ে দিল।

॥ ২ ॥

সোমবার। শীতকালের সন্ধে সাতটা হলেও কলেজ স্ট্রিট হ্যারিসন রোডের মোড় বাস ট্রাম-গাড়ি ঠেলা লোকজনের ভিড়ে জমজমাট। সোমনাথ সাতটার একটু আগেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সেই যুবকটি কোনদিক থেকে আসে দেখবার জন্যে উলটো দিকের ফুটপাথে একটা নামী দোকানের সামনে দাঁড়াল। যাতে কেউ না সন্দেহ করে।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় সাতটার সময় কলেজ স্ট্রিট মার্কেট থেকে যুবকটি বেরিয়ে এল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যুবকটি অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। সোমনাথ বুঝল যে, সে খুবই চঞ্চল হয়েছে। সে আর দেরি না করে রাস্তা পার হতে গেল। সোমনাথ ট্রামলাইন পেরুতেই যুবকটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সোমনাথ লক্ষ করল, তাকে দেখতে পেয়ে যুবকটির চোখে মুখে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে।

"নমস্কার," সোমনাথ বলল।

"নমস্কার। আপনি আমার যে কী উপকার করেছেন তা বলতে পারি না। সেটা এনেছেন?"

"হ্যাঁ। এই নিন আপনার জিনিস," বলে সোমনাথ পকেটে হাত দিল।

"দিন," বলে যুবকটি সোমনাথের দিকে হাত বাড়িয়েই একটা চাপা আর্তনাদ করে দ্বিতীয় কোনও কথা না বলে আর বাক্সটা না নিয়েই কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের মধ্যে ঢুকে গেল।

ব্যাপারটা কী বোঝবার জন্যে ঘাড় ফেরাতেই সোমনাথ দেখল প্রায় ছ' ফুট লম্বা মিশকালো দৈত্যের মতো একটা লোক সেই যুবকটির দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সোমনাথ দেখে নিয়েছে যুবকটি কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের কোন দিকে বেঁকেছে। ওই লোকটাও বোধহয় দেখতে পেয়েছে বলে সোমনাথের মনে হল। সে লম্বা-লম্বা পায়ে সোমনাথকে পাশ কাটিয়ে যুবকটির দিকে ধাওয়া করল। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের নিউ দার্জিলিং টি কোম্পানির দোকানে সন্ধেবেলায় চা কেনবার জন্যে বিরাট লাইন পড়ে যায়। লোকটা তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই সোমনাথ পাকা ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো ছোট্ট একটি লেঙ্গি মারতেই টাল সামলাতে না পেরে লোকটা সোজা গিয়ে পড়ল লাইনে দাঁড়ানো লোকেদের ওপরে। ব্যস্, অমনি শুরু হয়ে গেল বিরাট গোলমাল। গোলমালটা কতদূর গড়ায় তা দেখবার জন্যে অপেক্ষা না করে সোমনাথ হ্যারিসন

রোডের দিকে পা চালাল। হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে এসে সে হ্যারিসন রোড ধরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে দু'দিকের ফুটপাথে নজর রাখতে রাখতে হাঁটতে শুরু করল। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের কাছে হ্যারিসন রোড থেকে বাঁ দিকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে। সোমনাথ দেখল যুবকটি সেই গলির ভিতর ঢুকছে। সোমনাথ চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

সোমনাথ যুবকটির পিঠে হাত রাখতেই সে চমকে ঘুরে দাঁড়াল।

"ও আপনি! সেই লোকটা কোথায়?"

"বলছি," বলে সোমনাথ যুবকটিকে নিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে এল। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে যুবকটি বলল, "উঠুন।"

"কোথায়?"

"দেখুন জায়গাটা এখনও আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমি ওই লোকটাকে কিছুক্ষণের জন্যে আটকেছি। কিন্তু এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই আবার আপনার খোঁজে বেরিয়েছে।... ভাল কথা, লোকটাকে চেনেন নাকি?"

"কালকেও আর একজন আমাকে তাড়া করেছিল।"

"আমিও তাই অনুমান করেছিলুম। তাহলেই দেখছেন ওর সঙ্গে আরও লোক থাকাই সম্ভব। তাই এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়াটা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।"

যুবকটি আর কোনও কথা না বলে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। সোমনাথ ট্যাক্সিওলাকে পার্ক স্ট্রিটের একটা নাম-করা রেস্তোরাঁয় যেতে বলল। সোমনাথ আড়চোখে দেখল যুবকটির চোখে-মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। সে আর কোনও কথা বলল না। তবে একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে ভেতরে-ভেতরে খুশি হয়ে উঠল।

॥ ৩ ॥

কফি আর চিকেন স্যাণ্ডুইচের অর্ডার দিয়ে সোমনাথ যুবকটিকে বলল, "আসুন, আমাদের পরিচয়পর্বটা সেরে নেওয়া যাক। আমার নাম সোমনাথ সেন। পেশায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ—এই আমার কার্ড।"

যুবকটি হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিল। দামি সাদা কার্ডের ওপরে কালো কালিতে ইংরেজিতে লেখা সোমনাথ সেন। তার তলায় বেঁকানো হরফে লেখা প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কার্ডের তলায় বাঁদিকের কোণে বাড়ির ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরও দেওয়া আছে।

"আমার পরিচয় তো পেলেন। এবার আপনার পরিচয়টা—"

যুবকটি উত্তেজিত হয়ে বলল, "আপনি—আপনি ডিটেকটিভ! সোমনাথবাবু,আপনার সাহায্যের আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

"দেখুন, গতকাল রাত্রিতে আর আজ সন্ধেবেলায় যে-সব ঘটনা ঘটে গেল তাতে আপনার ব্যাপারে আমি খুবই কৌতূহল বোধ করছি। তবে আপনার সব ব্যাপার জানতে পারলেই আমি বলতে পারব যে, আমি আপনার কোনও প্রয়োজনে লাগব কি না।"

সোমনাথের মনে হল যুবকটি বোধহয় একটু দমে গেল। তারপর একটু পরে বলল, "বেশ তাই হবে।...আমার নাম অমলকুমার বসু। আমি শিয়ালদার কাছে একটা কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। তবে আমার সব কথা তো এখানে খুলে বলা যাবে না—"

সোমনাথ বলল, "বেশ তো কফিটা শেষ করে চলুন না, আমার বাড়িতে যাই।"

"চলুন।"

হোটেল থেকে বেরিয়েই বরাতজোরে ওরা একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। বাড়িতে এসে সোমনাথ বলল, "বলুন অমলবাবু, আপনার কাহিনী।"

"সোমনাথবাবু, আপনি কি প্যাকেটটা খুলেছিলেন?"

"কী আশ্চর্য! আপনার প্যাকেট আমি খুলতে যাব কেন? এই নিন আপনার প্যাকেট।"

কোটের ভেতরের পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে অমলের হাতে দিয়ে একটু মুচকি হেসে সোমনাথ বলল, "তবে এর ভেতরে কী আছে, তা আন্দাজ করতে পেরেছি।"

"বলুন তো কী আছে?"

"দামি পাথর।"

সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে অমল বলল, "হুঁ। আচ্ছা আগে এই প্যাকেটটাই খোলা যাক।"

খুব সন্তর্পণে অমল প্যাকেটটা খুলতে লাগল। দড়িটা খুলতে প্রথমে একটা খবরের কাগজের মোড়ক। তার ভেতরে আবার ব্রাউন পেপারের মোড়ক টোন সুতো দিয়ে বাঁধা। সেটা খুলতে বেরোল সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা খুব সাধারণ একটা পেস্ট বোর্ডের বাক্স। অমল বাক্সটা সাবধানে টেবিলের ওপর রেখে ঢাকাটা খুলতেই সোমনাথ দেখল একটা তুলোর আস্তরণ। তুলোর আস্তরণটা সরাতেই ইলেকট্রিকের আলোয়

কাছে, আরো কাছে পেতে–ক্লোজ-আপ

এই অলস, কুয়াশাঘেরা, পাগল করা গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলা...হাসিখেলা ভাগ ক'রে নিয়ে, মুখর, গুঞ্জনে ভরা বেলা—আর এই মিলন-খেলায় মেতে উঠতে আপনার মধ্যে আছে ভরপুর আত্মবিশ্বাস—ক্লোজ-আপের আত্মবিশ্বাস!

স্বচ্ছ লাল ক্লোজ-আপের অতি সাদা করার দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় সবচেয়ে সাদা আর এর বিশেষ মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় সবচেয়ে তাজা!

তাই ক্লোজ-আপের হাসি হাসুন আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাছে, আরো কাছে আসুন—কারণ, ক্লোজ-আপ যে শুধু কাছে, আরো কাছে পাওয়ার জন্যেই!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

LINTAS CX592619 BG

ছোট বড় নানা আকারের অনেকগুলো হিরে ঝলসে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে যাবার যোগাড়। সোমনাথের মনে হল এগুলোর দাম খুব কম হলেও লাখ-পাঁচেক টাকা হবে।

অমল জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা সোমনাথবাবু, আপনি এর ভেতরে পাথর আছে জানলেন কী করে?"

"বলছি। আপনি আমার হাতে বাক্সটা দিয়ে দেবার পরই আমি বিবেকানন্দ রোডের বাঁ দিকে ছুটলুম, তখন যারা আপনাকে তাড়া করে আসছিল তারা গুলি ছোঁড়ে। সৌভাগ্যবশত গুলিটা আমার অল্প দূর দিয়ে চলে যায়।"

সোমনাথের কথার মধ্যে অমল বলল, "কী সর্বনাশ।"

"তখনই আমি বুঝতে পারি যে, যে-জিনিস হাতাবার জন্যে লোকে মানুষ খুন করতেও পিছপা হয় না সেটা খুবই দামি জিনিস। বাড়ি ফিরে এসে বাক্সটা আমি বাইরে থেকে ভাল করে পরীক্ষা করি। দেখলুম কোথাও-কোথাও আঙুলের চাপে বাক্সটা বসে যাচ্ছে, আর কোথাও-কোথাও বসছে না। যেখানে-যেখানে বসছে না, সেখানে খুব শক্ত কিছু রয়েছে। যেখানে বসে যাচ্ছে সেখানে কিছু নেই। কী হওয়া সম্ভব? দামি পাথর ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তবে দামটা আমি আরও কম অনুমান করেছিলুম।"

"এই পাথরগুলোর দাম কত হবে বলে আপনার মনে হয়?"

"আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে পাঁচ সাত লাখ টাকা তো বটেই।"

"দশ লাখ।"

"তো এগুলো নিয়ে আপনি এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?"

"আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমাদের পারিবারিক কথা কিছু বলা দরকার।"

"বলুন।"

॥ ৪ ॥

অমল বলতে শুরু করল।

"আমাদের পূর্বপুরুষ বীরভূমের এক গ্রামের জমিদার ছিলেন। আমার পিতামহ বুঝেছিলেন যে, দিনকাল বদলাচ্ছে। জমিদারির ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। তাই তিনি তাঁর দুই ছেলে মানে আমার বাবা আর কাকাকে কলকাতায় রেখে পড়াতে লাগলেন। আমার বাবা ছিলেন শান্তশিষ্ট আর কাকা ছিলেন দারুণ ডানপিটে। দুজনেই লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। তবে বাবা থাকতেন শুধু পড়াশোনা নিয়ে, আর কাকার পড়াশোনার সঙ্গে ছিল খেলাধুলোও। সব রকম খেলাধুলো, সাঁতার, সাইক্লিং, ড্রাইভিং, শুটিং সব কিছুতেই তিনি ছিলেন খুব দক্ষ। আমার বাবা যখন এম.এ পড়ছেন আর কাকা সবে মাত্র বি. এসসি. ক্লাসে ঢুকেছেন সেই সময় আমার ঠাকুর্দা হঠাৎ মারা যান। জমিদারির আয় ততদিনে শুধু শূন্য নয়,আমেরিকানদের ভাষায় যাকে বলে সাব জিরো, তাই হয়েছে। আমার ঠাকুর্দা মারা যাবার অল্প কিছু দিন পরেই আমার ঠাকুমা মারা যান। বাবা এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে একটা বেসরকারি আপিসে চাকরি নেন। কাকার অবশ্য তখনও বি. এসসি. পড়া শেষ হয়নি। বাবা অনেকবার বলা সত্ত্বেও বি. এসসি পাশ করার পর কাকা আর পড়লেন না। চাকরি নিলেন এক মার্চেন্ট নেভি কোম্পানিতে। বেশ কয়েক বছর কেটে যাবার পর, তখন আমি হয়েছি, বাবা কাকাকে ডেকে বললেন, 'কমল এবার একটা বিয়ে-টিয়ে কর।' বলতে ভুলে গেছি আমার বাবার নাম বিমলকুমার আর কাকার নাম কমলকুমার।

"বাবার কথার জবাবে কাকা বললেন, 'ওইটি মাফ করো দাদা। আমি একটু বেড়াতে যাব।'

"বাবা বললেন, 'বেশ তো বেড়াতে যেতে ইচ্ছে হয় যাবি, তার সঙ্গে বিয়ে না করবার কী আছে?'

" 'আমি যে একটু দূরে যাব, দাদা।'

" 'দূরে মানে কোথায়?'

" 'প্রথমে যাব ইংল্যাণ্ড। তারপর ইউরোপ ঘুরে আমেরিকার উত্তর দক্ষিণ দুটোই। তারপর আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ায় যাব। মানে গোটা পৃথিবীটায় একটা চক্কর লাগিয়ে আসব।'

"বাবা মায়ের কোনও কথা না শুনে একদিন কাকা ওঁদেরই কোম্পানির জাহাজে চড়ে ভেসে পড়লেন।

"প্রথম প্রথম কাকা নিয়মিত চিঠি দিতেন। তারপর যত দিন যেতে লাগল কাকার চিঠির সংখ্যাও কমতে লাগল। শেষকালে এমন হল যে, বছরে একখানার বেশি চিঠি আর আসত না। ইতিমধ্যে আমাদের সংসারেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাবা মারা গেছেন। আমি এম. এ পাশ করে কলেজে চাকরি নিয়েছি। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর থেকে কাকার চিঠি আরও কমে গেছে। বেশ কয়েক বছর আগে কাকার শেষ চিঠি এসেছে।

"হঠাৎ বছর তিনেক আগে পুজোর ঠিক আগে কাকার একটা চিঠি এল। কাকা লিখেছেন,—তারিখটা আমার মনে আছে—সতেরোই সেপ্টেম্বর বি. ও. এ. সি.-র ফ্লাইটে দমদমে পৌঁছবেন সকাল সাড়ে আটটায়, আমি যেন দমদমে হাজির থাকি। প্রায় আঠারো-উনিশ বছর পরে আমাদের দেখা হচ্ছে, তাই চেনবার সুবিধের জন্যে আমি যেন একটা খবরের কাগজ বগলে চেপে রাখি আর সম্ভব হলে সাদা জামা-কাপড় পরে আসি।

"আমি তো কাকার আসবার দিন আটটার অনেক আগেই দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেলুম। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটটায় প্লেন নামল। কাস্টমসের চেকিং সেরে যাত্রীরা একে একে বেরুতে লাগলেন। একজন বেশ লম্বা-চওড়া ভদ্রলোক, মাথার সব চুল পাকা, ফর্সা রং, দুহাতে দুটো বড় বড় স্যুটকেস আর কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'খোকা?'

"'কাকা।' আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। কাকা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"কাকা আসবার পর আমাদের মা-ছেলের একঘেয়ে জীবনে বেশ একটা বৈচিত্র্য এল। গ্লোব ট্রটার বলতে যা বোঝায় কাকা তাই। মেরুপ্রদেশ আর এভারেস্টের চুড়ো ছাড়া পৃথিবীতে বোধহয় এমন কোনও জায়গা কমই আছে যেখানে কাকা যাননি। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা দোতলার বারান্দায় বসে কাকার মুখে তাঁর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত মজার, ভয়ের নানা বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা শুনি। কাকা বলতে

পারেন খুব ভাল। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হয় সে সব ঘটনা যেন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। যাই হোক, কাকা ফিরে আসাতে যে নতুনত্বের চমক লেগেছিল আস্তে-আস্তে সেটা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

"কাকা বেশির ভাগ সময়েই বাড়িতে থাকতেন। কখনও-কখনও হয়তো বা হৃষীকেশ পার্কে বেড়াতে যেতেন। বলাই সিংহি লেনে আমাদের নিজস্ব একটা ছোট দোতলা বাড়ি আছে। কলকাতা ছেড়ে যাবার পর কাকার ছেলেবেলার বন্ধুদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। তাই এতদিন পরে ফিরে এসে তাদের সঙ্গে আবার নতুন করে বন্ধুত্ব করতে চাননি। চিঠিপত্রও কাকার বেশি আসত না। তবে সাউথ আফ্রিকা থেকে হরজিন্দার সিং বলে এক ভদ্রলোক প্রায় নিয়মিত চিঠি দিতেন। হরজিন্দারের চিঠি এলে কাকা খুব খুশি হতেন। কাকা একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, হরজিন্দার খুব সৎ আর সাহসী লোক। আফ্রিকায় আর সাউথ আমেরিকায় তিনি কাকার চব্বিশ ঘণ্টার সাথী ছিলেন। হরজিন্দার দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে থেকে গেছেন।

"বেশ চলছিল, হঠাৎ কাকা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার দেখে বললেন, সিরিয়াস হার্ট অ্যাটাক। এ-যাত্রা রক্ষে পেলেও আর বেশি দিন বাঁচবেন না। যাই হোক, ক'দিন খুব টালমাটাল চলবার পর কাকা একটু সেরে উঠলেন।

"একদিন খাওয়া-দাওয়ার পর কাকা আমাকে ডেকে বললেন, 'খোকা আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।' আমি কাকার ঘরে গেলুম। কাকা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি দরজা বন্ধ করে দিলুম। কাকা আমাকে আলমারির তলা থেকে তাঁর বুট জুতো জোড়া আনতে বললেন। আমি আশ্চর্য হয়ে কাকার দিকে তাকাতে কাকা বললেন, 'যা বলছি কর। আমার সময় বেশি নেই।' কথা না বাড়িয়ে আমি বুট জুতো জোড়া নিয়ে গেলুম। জুতো জোড়া আমার হাত থেকে নিয়ে কাকা পাটি দুটোর গোড়ালির কাছটা উলটো দিকে জোরে ঘোরাতেই সেটা খট্ শব্দ করে খুলে গেল। আর তারপর সে-দুটো বিছানার ওপর উপুড় করতেই ওই যে হিরেগুলো দেখছেন, বেরিয়ে এল। ব্যাপার দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। আমার দিকে তাকিয়ে কাকা বললেন, 'ভয় পাস না, এগুলো চোরাই মাল নয়। এগুলো সৎপথে উপার্জন নয়, বলতে পারিস অর্জন করা। তবে এর আর্ধেক হরজিন্দার সিংয়ের। আমার অবর্তমানে হরজিন্দার সিং যদি কোনও দিন আসে তবে এর আর্ধেক তাকে দিয়ে দিবি। হরজিন্দার সিংকে চিনবি কী করে? তার কাছে আমার আর তার একসঙ্গে তোলা ছবি আছে। তার উলটো দিকে তোর নাম লিখে দিয়েছি। তবে আমার অবর্তমানে অশোক দাসোয়ানি বলে কেউ যদি আসে আর হিরের কথা তোলে তো বলবি যে, হিরের কথা তুই কিছু জানিস না। সে যেন হরজিন্দার সিংয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে। দাসোয়ানি খুব সাংঘাতিক ধরনের লোক। ও হরজিন্দারকে বিপদে ফেলেছিল। আমাকে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি। উলটে আমিই ওকে এমন প্যাঁচে ফেলেছিলুম যে, তারপর থেকে ও আর আমার কাছে ঘেঁষেনি। যদিও আমার অনিষ্ট করবার বহু চেষ্টা করেছে।'

"তারপর কাকা আমাকে হিরেগুলো দিয়ে বললেন, 'কালকে বৌদির লকারে রেখে আসবি। হয়তো এগুলো বেশি কিছু নয়, তবে যা পেলি তাতে তোর জীবনে কখনও অসুবিধে হবে না। সৎপথে থাকিস, কেউ কিছু করতে পারবে না।' একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে কাকা বোধহয় ক্লান্তি বোধ করছিলেন। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। আমি ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে হিরেগুলো নিয়ে চলে এলুম।

"এর কয়েকদিন পরে কাকা মারা গেলেন। এটা হল গত বছরের এপ্রিল মাসের শেষে। এ তো গেল পুরনো কথা। এবার বর্তমানে আসি। তার আগে এক গেলাস জল খাওয়াবেন, সোমনাথবাবু?"

॥ ৫ ॥

জল খেয়ে অমল আবার বলতে শুরু করল।

"অনেক দিন পরে এই নভেম্বর মাসে হরজিন্দার সিংয়ের একটা চিঠি এল। চিঠিটা কাকাকে লেখা। লিখেছেন যে, তিনি ডিসেম্বরের প্রথমে কলকাতায় আসছেন। আমি সেই দিনই তাঁকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিলুম। তারপর দিন-সাতেক আগে চণ্ডীগড় থেকে লেখা হরজিন্দার সিংয়ের একটা চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন যে, তেরোই বা চোদ্দই তিনি কলকাতায় আসছেন। সদর স্ট্রিটে অ্যাস্টর হোটেলে থাকবেন, আমি যেন শনিবার মানে গত পরশু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আরও লিখেছেন যে, তিনি খবর পেয়েছেন অশোক দাসোয়ানি এ-দেশে এসেছে। কোথায় আছে জানেন না তবে কী জন্যে এসেছে সেটা আঁচ করতে পেরেছেন। সে বোসসাহেবকে, মানে কাকাকে না পেয়ে আমার ক্ষতি করতে পারে। আমি যেন সাবধানে থাকি।

"যাই হোক, চিঠিটা পেয়ে আমি তো শনিবার দিন লকার থেকে হিরেগুলো নিয়ে এলুম। হিরেগুলো আনবার পর দুপুরের দিকে একটা টেলিগ্রাম এল। হরজিন্দার টেলিগ্রাম করেছেন। বিশেষ কাজে কলকাতা আসার দিন পেছোতে হল। সোমবার মানে আজকের বিকেলের ফ্লাইটে আসছেন। আমি যেন সন্ধেবেলা অ্যাস্টর হোটেলে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করি। মুশকিল হল যে, যখন টেলিগ্রাম পেলুম তখন ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং বাধ্য হয়েই হিরেগুলো ঘরে রাখতে হল।

"গতকাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু শুয়েছি। আমাদের বাড়ির কাজের লোকটি এসে খবর দিল যে, একজন দেখা করতে চায়। গেলুম। দেখি একজন স্যুট-পরা ভদ্রলোক। বয়েস বুঝতে পারলুম না। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। মাঝারি গড়ন। তবে বেশ শক্তসমর্থ। দাড়ি আর চুল দুই কাঁচা-পাকা। ভদ্রলোক আমাকে দেখে নমস্কার করে ইংরেজিতে বললেন, 'আপনি মিঃ কমল বোসের ভাইপো? আমার নাম অশোক দাসোয়ানি। আপনি নিশ্চয়ই মিঃ বোসের কাছে আমার কথা শুনেছেন। অবশ্য কথাগুলো নিশ্চয়ই প্রশংসাসূচক নয়,' বলে লোকটি হাসতে লাগল।

"ভদ্রলোককে দেখে আমার খারাপ লাগেনি। এবার লাগল। দাসোয়ানির কথার মধ্যে একটা দম্ভ আছে। সেটা আমার ভাল লাগল না। আরও খারাপ লাগল যখন দেখলুম যদিও মুখের ভাবটা বেশ হাসিখুশি চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য রকম স্থির। দেখলেই কেমন গা শিরশির করে।

"মনের ভাব চেপে আমি বললুম, 'মিঃ দাসোয়ানি আপনি

হয়তো জানেন না যে, কাকা গত বছর মারা গেছেন।'

"একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে দাসোয়ানি বলল, 'জানি বইকী। এও জানি যে হিরেগুলো আপনার জিম্মায় আছে। আর হরজিন্দার আসছে তার শেয়ার নিতে।...আচ্ছা মিঃ বোস, আপনি কি জানেন যে, কী ভাবে ওই হিরেগুলো আপনার কাকা পান?'

"আমি না বলাতে দাসোয়ানি যা বলল তার সারমর্ম হল যে, ওই হিরেগুলো ওরই। কাকা আর হরজিন্দার অন্যায় ভাবে ওগুলো আত্মসাৎ করেছে।

" 'তবে মিঃ বোস, আপনি ছেলেমানুষ, আপনাকে আমি ঠকাতে চাই না। আমি আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি—'

"দাসোয়ানির কথা শুনে বিশেষ করে কাকার সম্বন্ধে এই কটূক্তিতে আমার সারা শরীর রাগে জ্বলে যাচ্ছিল, তাই ওকে শেষ করতে না দিয়ে বললুম, 'আপনার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না। আপনি মিথ্যেবাদী। এই মুহূর্তে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।'

" 'উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনি আমার হিরেগুলো আমাকেই বিক্রি করুন।'

"আমি বললুম, 'আপনি বোধহয় জানেন না, হিরেগুলো বিক্রি করা যাবে না, অন্তত পক্ষে যতদিন না হরজিন্দার সিং—'

" 'হরজিন্দার একটা শয়তান। আপনি ওর খপ্পরে পড়বেন না।'

" 'মাফ করবেন। হরজিন্দার সিংয়ের সঙ্গে কথা না বলে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারছি না।'

"আমার কথায় দাসোয়ানির মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল।

" 'মিঃ বোস আপনি একেবারে ছেলেমানুষ। আপনি অশোক দাসোয়ানিকে চেনেন না। সে যা চায় তা যেমন করেই হোক নেয়।'

" 'আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

" 'মোটেই না,' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে দাসোয়ানি বলল। আমি দেখতে পেলুম তার বাঁ বগলে রিভলভারের খাপ দেখা যাচ্ছে। আমি বুঝলুম যে, দাসোয়ানি ইচ্ছে করেই আড়মোড়া ভাঙল যাতে আমি রিভলভারটা দেখতে পাই।

"তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমি হোটেল-ডি-লাক্সে উঠেছি। যদি মত পরিবর্তন করেন, তা হলে আমায় একটা ফোন করবেন।'

"দাসোয়ানি চলে গেল। মনটা কিন্তু অস্বস্তিতে ভরে গেল। লোকটার কথাবার্তা হাবভাবে একটা উদ্ধত ভাব ফুটে বেরোচ্ছে। যাই হোক, সোমবার পর্যন্ত একটু সাবধানে থাকতে হবে। বাড়িতে বসে-বসে ভাল লাগছিল না, তাই মনটাকে হালকা করার জন্যে খানিকটা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি, পাড়ার দুটি ছেলে বলল, দুজন লোক নাকি তাদের কাছে জানতে চেয়েছে আমি কোন্ বাড়িটায় থাকি, বাড়িতে কে কে আছে এই সব। 'জানেন অমলদা, লোকদুটোর চেহারা দেখলে কেমন যেন ভদ্রলোক বলে মনে হয় না।' মনটা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে গেল। কী করি? মাকে বলে কোনও লাভ নেই। শুধু শুধু ভয় পাবেন।

"রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। বসে বসে একটা বই পড়ছিলুম। আমাদের কাজের লোকটি এসে বলল যে, সে নাকি সন্ধের পর থেকে দুটো লোককে আমাদের বাড়ির কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। তার কথায়, লোকদুটোকে দেখলে মনে হয় আস্ত গুণ্ডা।

"খুব মুশকিল হল। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলুম, যত গণ্ডগোলের মূল ওই হিরেগুলোকে আজ রাত্তিরেই সরিয়ে ফেলতে হবে। টমবি হোস্টেলের গলিতে আমার বন্ধু রজতদের বাড়ি। বৌবাজারে ওদের সোনারুপোর বিরাট কারবার। ওদের বাড়িতে ব্যাঙ্কের সেফ-ডিপোজিট ভল্টের মতো বিশাল আয়রন সেফ আছে। দুটো বন্দুকধারী নেপালি দরোয়ান পালা করে পাহারা দেয়। সোমবার পর্যন্ত হিরেগুলো ওদের বাড়িতে রেখে আসব। হিরেগুলো ওইভাবে বাক্সর মধ্যে পুরে কাগজে মুড়ে নিলুম।

"আমাদের বাড়ির সদর দরজাটা বলাই সিংহি লেনের ওপর। তবে আমাদের বাড়ির উত্তর দিকে একটা খুব সরু গলি আছে। দুজন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। সেই গলির দিকে আর একটা দরজা আছে। গলিটার কথা পাড়ার লোকেরা ছাড়া কেউ জানে না। গলিটা আমহার্স্ট স্ট্রিটে যেখানে গিয়ে পড়েছে সেখানে সব সময়েই আবর্জনার এমন পাহাড় যে, গলিটা চট করে নজরে পড়ে না। ঠিক করলুম গলিটা দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে যাব। কেউ দেখতে পাবে না। হল-ও তাই। কিন্তু আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৌঁছোন মাত্রই পরপর দুটো জোরালো শিসের শব্দ শুনতে পেলুম। কেউ যেন

কাউকে ইঙ্গিতে কিছু জানিয়ে দিল। স্রেফ ভয়ে আমি দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলুম। তারপরের ঘটনা তো সবই আপনার দেখা।"

একটানা এতক্ষণ কথা বলে অমল চুপ করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বলল," ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা অমলবাবু, আপনার কাকার জিনিসপত্রের মধ্যে ডায়েরি ধরনের কিছু ছিল কি ?"

"না। কাকার লেখার অভ্যেস বিশেষ ছিল না। আর কাকা ছিলেন যাযাবর টাইপের। নিজের রোজ ব্যবহারের জিনিস ছাড়া অতিরিক্ত একটি জিনিসও রাখতেন না। ওঁর কথা ছিল প্রয়োজনকে যতদূর সম্ভব কম করো।"

"তা হলে হিরেগুলোর আসল ইতিহাস জানেন হরজিন্দার সিং, আর অশোক দাসোয়ানি। তবে দাসোয়ানি আপনাকে যে কথা বলেছে তা আমার সত্যি বলে মনে হয় না। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য হল হরজিন্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।....চলুন বেরনো যাক।"

"কোথায় ?"

"কেন আপনার তো হরজিন্দারের সঙ্গে আজই দেখা করতে হবে। তারপর আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব।"

"চলুন।"

"আপনার বাক্সটা সাবধানে রাখুন" বলে সোমনাথ উঠে পড়ল। বেরোবার সময় সোমনাথ বাহাদুরকে ডেকে দরজা বন্ধ করে দিতে বলল।

॥ ৬ ॥

রাস্তায় এসে সোমনাথ দেখল দু'একটা আলো টিমটিম করে জ্বলছে। অধিকাংশ আলোই জ্বলছে না। শীতকাল, তার ওপর রাতও হয়েছে। জানলা বন্ধ থাকায় বাড়ির আলোও নেই। দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলল। "চলুন বড় রাস্তায় হয়তো ট্যাক্সি মিলে যেতে পারে।"

বড় রাস্তার কাছাকাছি এসেছে, হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে দুজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে সোমনাথের ওপর এলোপাথাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল। প্রথম আঘাত আর বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে সোমনাথ তার সামনের লোকটাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে মারলে এক ঘুসি। 'ওফ্' শব্দ করে লোকটা পড়ে গেল। আর তখনই সোমনাথের মাথায় কে যেন একটা শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করল। তার চোখের সামনে নানা রঙের ফুলঝুরি জ্বলে উঠল। সে বসে পড়ল। মিনিট দেড়েক পরে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটতে সোমনাথ মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল রক্ত পড়ছে নাকি। না মাথা ফাটেনি। সে চাপা গলায় ডাকল, "অমলবাবু, অমলবাবু"। বুঝল, সে যা আশঙ্কা করেছিল সেটাই হয়েছে। অমল নেই। দাসোয়ানি বেশ আঁটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে। তার মানে তার দলে অনেক লোক আছে, আর কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের পর থেকে ওর দলের লোকেরা সব সময়েই ওদের চোখে-চোখে রেখেছে। ওরা অমলকে কিডন্যাপ করতে এসেছিল, সোমনাথ থাকায় অসুবিধে হয়েছে। সোমনাথ চিন্তিত হয়ে পড়ল। হিরেগুলো অমলের কাছে আছে। হিরেগুলো না থাকলে অমলের বিপদের ভয় থাকত কম। হিরেগুলো হাতে পেলে যে ওরা অমলকে খুন করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না, এ বিষয়ে সোমনাথ দৃঢ় নিশ্চিত। এখন অমলকে বাঁচাবার একমাত্র পথ হোটেল-ডি লাক্সে যাওয়া।

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। মাথার একপাশটা টাটিয়ে গেছে। সে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মনে হল, কেউ যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে। নিজের ব্যথার কথা ভুলে সোমনাথ শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল সেদিকে দৌড়ে যেতেই সে লোকটা ছুটতে শুরু করল। সোমনাথ তাকে পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরল। লোকটা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে সোমনাথ তার ডান হাতটা পিঠের দিকে বেঁকিয়ে প্রচণ্ড এক মোচড় দিতেই লোকটা যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

"লক্ষ্মীছেলের মতো আমার সঙ্গে চুপচাপ এসো, নইলে হাত পা ভেঙে এখানে রেখে দেব।"

লোকটা কোনও কথা না বলে সোমনাথের সঙ্গে এল। কলিংবেল টিপতেই নেপালি ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। তাকে একটা শক্ত দড়ি আনতে বলে সোমনাথ লোকটাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। বাহাদুর দড়ি নিয়ে এলে সোমনাথ লোকটার হাত পা কষে বেঁধে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, "যা জিজ্ঞেস করছি তার ঠিক ঠিক জবাব দিলে তোমাকে ছেড়ে দেব। না দিলে পুলিশে দেব।"

লোকটা চুপচাপ সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমার হাতে সময় নেই। কথার জবাব দেবে কি না বলো।"

কোনও উত্তর নেই। চটাস্। লোকটার গালে একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে সোমনাথ টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলল, "আমি ঠিক পাঁচ গুনব। তার মধ্যে উত্তর না দিলে থানায় ফোন করব। এক...দুই...তিন..."

"বলছি, বলছি।"

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সোমনাথ বললে, "কী নাম তোমার ?"

"হরু।"

"তোমরা ক-জন ছিলে ?"

"চারজন।"

"কে তোমাদের কাজে লাগিয়েছে ?"

"রতন।"

"রতন তোমাদের কী করতে বলেছিল ?"

"ওই ছেলেটাকে তুলে নিয়ে যেতে।"

"কোথায় ?"

লোকটা ইতস্তত করছে দেখে সোমনাথ বলল, "বলো কোথায় ?"

"খালপাড়ে লাহাবাবুদের ভাঙা বাগানবাড়িতে।"

"কেন ?"

"জানি না।"

"এখান থেকে ওরা কি সোজা ওখানেই যাবে ?"

"হ্যাঁ। লাল্লু, ভজা আর আমার ছেলেটাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল। রতন যাবে সাহেবকে খপর দিতে।"

"কে সাহেব ?"

"জানি না।"

সাহেব কোথায় থাকে জানতে চাইলে লোকটা বলল যে সেটাও সে জানে না।

"ঠিক আছে। আমি এখন বেরুচ্ছি। তোমার খবর যদি ঠিক হয় তো ফিরে এসে তোমাকে ছেড়ে দেব। আর যদি ভুল খবর দিয়ে থাক তো তোমার অদৃষ্টে কষ্ট আছে," সোমনাথ বলল। তারপর সে লোকটার মুখে একটা হাত-মোছা তোয়ালে পুরে লোকটাকে বাথরুমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। বাহাদুরকে হুঁশিয়ার থাকতে বলে সোমনাথ বেরুল। যাবার আগে রিভলভারটা নিতে ভুলল না।

॥ ৭ ॥

শীতকালের সাড়ে দশটা। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। সোমনাথ সার্কুলার রোডের দিকে পা চালাল। খানিকক্ষণ চেষ্টার পর সে একটা ট্যাক্সি পাকড়াল। ট্যাক্সিওলা প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল। সোমনাথ নিজের পরিচয় দেওয়াতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

খালপাড় জায়গাটা দিনের বেলায় মোটেই নির্জন নয়। ছোটখাটো অনেক কারখানা আছে। কিন্তু সন্ধের পর এই সব কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে ওই অঞ্চলে লোকবসতি আছে বলে মনে হয় না। এখন তো বেশ রাত। দূরে দূরে বস্তির ঘরগুলো সব অন্ধকার। বড় রাস্তার ওপর ট্যাক্সিওলাকে দাঁড়াতে বলে সোমনাথ সন্তর্পণে এগিয়ে চলল খালের ধার দিয়ে। বেশ কুয়াশা হয়েছে খালের ধারে। মাঝেমাঝে কুকুর ডেকে উঠছে আর রাস্তা থেকে গাড়ি যাতায়াতের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে।

খালের ধারে লাহাবাবুদের বাগানবাড়ি যে কতদিন এমন জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে তা কেউ জানে না। সোমনাথ দেখল যে, লোহার গেটের একটা পাল্লা নেই। আর একটা পাল্লা হাট করে খোলা। চওড়া রাস্তা সোজা চলে গেছে।সোমনাথ সাবধানে এদিকে-ওদিকে নজর রাখতে রাখতে এগিয়ে চলল। এককালে যেটা সাজানো গোছানো বাগান ছিল এখন সেটা অযত্নে অবহেলায় জঙ্গলের রূপ নিয়েছে। বাগানের মাঝখানে দোতলা বাড়ি। কুয়াশার চাদরে মোড়া শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট ভাবে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। সোমনাথ দেখল বাড়িটার কয়েকটা জানালা বন্ধ, বাকিগুলো খোলা। কোথাও আলো জ্বলছে বলে মনে হল না। লোকটা কি তাকে ধাপ্পা দিল ? যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাকে দেখতেই হবে। সোমনাথ পা টিপে-টিপে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল।

সোমনাথ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। সদর দরজাটা বন্ধ। সোমনাথ শিকারির মতো নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে এসে হাত দিয়ে একটু ঠেলতেই দরজাটা অল্প ফাঁক হয়ে গেল। সে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রায় মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে যখন বুঝল যে, ধারেকাছে কেউ নেই তখন দরজাটা আরও একটু ফাঁক করে সে ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। সোমনাথ সেফ্‌টি ক্যাচ খুলে রিভলভারটা ডান হাতে নিয়ে বাঁহাতে ছোট ইলেকট্রিক টর্চটা ধরল। অন্ধকারে যখন তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেল তখন সে টর্চের আলো ফেলে তার চারদিকটা দেখে নিল। এটা একটা হলঘরের মতো। একপাশ দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে। হলঘরের লাগোয়া যে সব ঘর আছে, সেগুলো তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে সোমনাথ নিশ্চিন্ত হল, সেখানে কেউ

নেই। তখন সে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সিঁড়িটা উঠে গেছে সোজা দোতলায়। সিঁড়ির দুপাশে দুটো বারান্দা। বারান্দার কোলে পর পর ঘর। বেশিরভাগ ঘরই অন্ধকার। একটা ঘর থেকে ক্ষীণ আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। এতক্ষণে সোমনাথ নিশ্চিত হল যে, হরু ভুল খবর দেয়নি। বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে যে ঘরটা থেকে আলো আসছিল সেই দিকে সোমনাথ এগিয়ে চলল। ঘরটার কাছে যেতে টুকরো টুকরো কথাবার্তা তার কানে ভেসে এল।

"হ্যাঁ রে, ভজা, রতন কখন আসবে বল তো ?"

"কী জানি, সায়েবের সঙ্গে দেখা করে তো আসবে।"

"সায়েবটা কে বল তো ?"

"জানি না। তবে হরুটাকে ওভাবে ফেলে আসা ঠিক হয়নি। ওকে যদি টিকটিকিটা ধরে ?"

"কে ধরবে ? ওই ছেলেটার সঙ্গে যে টিকটিকিটা ছিল ? ব্যাটাকে যা এক ঘা দিয়েছি, পাক্কা দুটি ঘণ্টার ধাক্কা। ততক্ষণে হরু ঠিক সরে পড়বে। হরুর বাবা বিল্লির জান্।"

সোমনাথ রিভলভারের বাঁটটা দিয়ে কাঠের রেলিংয়ে ঠক করে আওয়াজ করল।

"কে আওয়াজ করল রে লাল্লু ?"

"কে আবার,ওই ছোঁড়াটা বোধ হয়। দরজা খোলবার চেষ্টা করছে। যত পারে শব্দ করুক গে। চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না।"

সোমনাথের উদ্দেশ্য হল ওদের ঘর থেকে বের করে আনা। সে এবারে একটা ঘরের দরজায় দড়াম করে এক লাথি কষাল।

নতুন ভোর হল নতুন রোদ উঠল

নতুন সানলাইট

ডিটারজেন্ট পাউডার

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

আপনিও আপনার ঘরে সানলাইটের ঝলমলানি আনুন। নতুন সানলাইট ডিটারজেন্ট পাউডার ওজনে খুব হাল্কা, কিন্তু কাজ দেয় বেশি। দামী পাউডারের মত কাজ দেয়, অথচ দাম কম।

সানলাইটে একটি এমন উপাদান আছে, যা সাধারণ পাউডারে নেই। এটি কাপড়ের প্রতিটি তন্তু থেকে ময়লা বের করে দিয়ে তাতে চমক নিয়ে আসে।

সানলাইটে না হয় হাতের কষ্ট, না হয় কাপড়ের ক্ষতি। আর এর তাজা মনোরম সুগন্ধ আপনার কাপড়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

আপনিও আপনার জীবনে নিয়ে আসুন সানলাইটের চমক। একবার ব্যবহার করে দেখুন—দাম খুবই কম।

আপনার কাপড়ে এনে দেয় রোদের চমক

হিন্দুস্তান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

OBM/2568/R/BEN

"আহ্, ভারী জ্বালাতন করলে তো !"

"দাঁড়া একবার দেখে আসি।"

"সোমনাথ এটাই চাইছিল। সে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল। লণ্ঠন হাতে একজন বেরিয়ে এল। লোকটা এমন নিশ্চিন্তভাবে বেরিয়ে এল যে, সোমনাথ বেশ চমকে গেল। ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝবার আগেই সোমনাথ লোকটার নাকে মারল এক ঘুঁসি। ফট করে একটা শব্দ হল। লোকটার হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে গেল।

"এই ভজা কী হল রে ?" ঘর থেকে লাল্লু জিজ্ঞেস করল।

লোকটা কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানি ছাড়া কিছুই বেরুল না।

"জ্বালালে দেখছি," বলে লাল্লু ঘর থেকে বেরুতেই সোমনাথ টর্চের আলোটা তার মুখে ফেলে বলল, "হ্যাণ্ডস আপ্। নইলে গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

সোমনাথের হাতে রিভলভার দেখে লোকটা কোনও কথা না বলে মাথার ওপর হাত তুলল।

"যাকে ধরে নিয়ে এসেছ সে কোথায় ?"

"পাশের ঘরে।"

"তাকে খুলে দাও।"

লোকটা একটু ইতস্তত করতেই সোমনাথ রিভলভারের ট্রিগারে অল্প চাপ দিয়ে বলল, "দেরি কোরো না। তাড়াতাড়ি খোলো।"

লোকটা পায়ে পায়ে একটা তালাবন্ধ ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে সোমনাথকে আক্রমণ করার চেষ্টা করতেই সোমনাথ ওর পায়ে গুলি করল। লোকটা পড়ে গেল।

"বাঁদরামি করার ফল দেখলে তো ? শিগগির দরজা খুলে দাও।"

লোকটা কোনওরকমে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দরজাটার কাছে গিয়ে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে ঘরের দরজাটা খুলে দিল।

"অমলবাবু ?"

"কে ? সোমনাথবাবু ?"

"হ্যাঁ, চটপট বেরিয়ে আসুন।"

অমল বেরিয়ে এলে সোমনাথ লাল্লু আর ভজাকে বলল, "প্রাণে বাঁচতে চাও তো সিধে ওই ঘরে চটপট ঢুকে পড়ো।"

ওরা প্রতিবাদ না করে ঘরে ঢুকল। দরজায় তালা লাগিয়ে সোমনাথ অমলকে বলল, "চলুন।"

"আচ্ছা সোমনাথবাবু, আমাকে যে এখানে এনেছে আপনি জানলেন কী করে ?"

"সে অনেক কথা, পরে বলব। তবে বিপদ আপনার এখনও কাটেনি। এখন কোনও কথা নয়, আমার সঙ্গে আসুন।"

ওরা যখন সদর দরজাটা বন্ধ করে বাগানে এসে দাঁড়িয়েছে, সোমনাথ কান খাড়া করে একমুহূর্ত কী যেন শুনল তারপর অমলকে প্রায় টানতে টানতে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে চলে গেল। আর তার একটু পরেই একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি কেবলমাত্র সাইড লাইট দুটো জ্বালিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে সোজা সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

সামনের দরজা খুলে একজন লোক নামল। লোকটাকে সোমনাথ চিনতে পারল। সেই কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে দেখা দৈত্যাকৃতি গুণ্ডাটা। সে নেমে পিছনের দরজাটা খুলে খুব কায়দা করে দাঁড়াল। গাড়ির পিছনের সিট থেকে নামলেন একজন ভদ্রলোক। অমল সোমনাথের কানে কানে বলল, "ওই লোকটা অশোক দাসোয়ানি।"

সোমনাথ বলল, "হুঁ।"

গাড়ি থেকে নেমে লোকটি বলল, "ক্যা রোতন সব ঠিক হ্যায় ?"

"হাঁ, সায়েব।"

"সায়েব মত বোলো। হাম তুমহারা দোস্ত হ্যায়। আভি চলো—"

ওরা কথা বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। ড্রাইভার নামল না। গাড়িতে বসে রইল। সোমনাথ বুঝল এখনই ওরা জানতে পারবে যে চিড়িয়া উড়ে গেছে। ওরা এখান থেকে বড় রাস্তায় পৌঁছে ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে দাসোয়ানি ওদের ধাওয়া করবে। দাসোয়ানি ওদের ধরতে পারবে কি পারবে না সেটা ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি চান্স। সে অমলকে চুপি চুপি বলল, "খুব সাবধানে পা টিপে টিপে গেট পর্যন্ত গিয়ে ছুটে বড় রাস্তায় যাবেন। সেখানে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিওলাকে আমার নাম করে বলবেন যে, সে যেন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রেডি থাকে। আপনি যাবার দু মিনিটের মধ্যে আমি এখান থেকে বেরুব। বুঝেছেন ?"

"হ্যাঁ" বলে অমল চলে গেল।

অমল চলে যাবার পর ঠিক একশ কুড়ি গুনে সোমনাথ পকেট থেকে রিভলভার বের করে হাঁটু গেড়ে বসে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার পেছনের চাকা লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ল। ক্র্যাক্ করে একটা শব্দ হল তারপরই ভস্ করে গাড়ির পেছনের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ দৌড় দিল।

সোমনাথ ট্যাক্সিতে চাপামাত্র ট্যাক্সিওলা গাড়ি ছেড়ে দিল।

"কোথায় যাব স্যার ?"

"বলাই সিংহি লেন।"

গাড়িতে যেতে যেতে সোমনাথ অমলকে সংক্ষেপে সব কথা বলল। ঠিক হল যে কাল সকালে সোমনাথ অমলের বাড়িতে আসবে। তারপর দুজনে হরজিন্দার সিংয়ের কাছে যাবে।

॥ ৮ ॥

সোমনাথ আটটার সময়ে অমলদের বাড়িতে হাজির হল। অমল তার মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সোমনাথ বুঝল যে গত রাত্রের কোনও কথা অমল তার মাকে বলেনি। অমলের মা ছাড়লেন না। জোর করে চা আর ঘরের তৈরি শিঙাড়া খাইয়ে দিলেন।

অমলকে নিয়ে সোমনাথ যখন অ্যাস্টর হোটেলে পৌঁছল তখন ন'টা বেজে গেছে। সদর স্ট্রিটের ওপর অ্যাস্টর হোটেল। বেশ নিরিবিলি। অভিজাত। রিসেপশনে গিয়ে হরজিন্দার সিংয়ের নাম করতে রিসেপশনিস্ট বললেন, "এক মিনিট।" তারপর ফোন তুলে কাকে যেন বললেন, "স্যার ৪৩৯ নম্বরের বোর্ডার হরজিন্দার সিংয়ের সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।"

ফোনের ওপাশ থেকে নির্দেশ পেয়ে রিসেপশনিস্ট বললেন, "ঠিক আছে স্যার।" তারপর বেল টিপে একজন

বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "এঁদের ম্যানেজারসায়েবের ঘরে নিয়ে যাও।"

বেয়ারা তাদের সেলাম করে বলল, "চলিয়ে সাব।"

ম্যানেজারের ঘরে পা দিয়েই প্রথমে যেটা সোমনাথের নজরে পড়ল সেটা হল যে, ঘরের মধ্যে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর বসে আছেন।

ম্যানেজার তাদের বললেন, "আপনারা হরজিন্দার সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

সোমনাথ বলল, হ্যাঁ।" তারপর অমলকে দেখিয়ে বলল, "হরজিন্দার সিং এঁদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড। মিঃ সিং এঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তিনি কলকাতায় আসছেন এবং অ্যাস্টর হোটেলে উঠছেন। ইনি যেন অবশ্যই ওঁর সঙ্গে দেখা করেন।··· আচ্ছা, কী ব্যাপার বলুন তো?"

"ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে।" সোমনাথ নিজের আর অমলের পরিচয় দিল। সোমনাথের পরিচয় পেয়ে ম্যানেজার আর ইন্সপেক্টরের চোখাচোখি হয়ে গেল।

"সোমনাথবাবু, আপনি যখন রয়েছেন তখন আসল ব্যাপারটা বলেই ফেলি। কী বলুন ইন্সপেক্টর লালমোহন দাস।"

দাস ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"মিঃ সিং তাঁর ঘরে খুন হয়েছেন।"

"সে কী!" সোমনাথ আর অমল এক সঙ্গে বলে উঠল।

"হ্যাঁ।"

সোমনাথ ইন্সপেক্টর দাসকে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন তো দু'একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"অবশ্যই। আমি তো ভাবছি এই কেসে আপনার সাহায্য পাব।"

"আমার সাধ্যমতো সাহায্য আপনাকে নিশ্চয়ই করব। তবে এ কেসের সঙ্গে আমাকে জড়াবেন না। আমি হঠাৎই আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে এসে পড়েছি।"

হাসতে হাসতে ইন্সপেক্টর দাস বললেন, "সে পরে দেখা যাবে। এখন কী প্রশ্ন করবেন বলছিলেন যেন—"

"মিঃ সিং যে খুন হয়েছেন এটা জানা গেল কী করে?"

"মিঃ সিংয়ের ঘরের দরজা নটা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। বেড-টি দিয়ে বেয়ারা ফিরে এসেছে। ক্লিনার দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পায়নি। তারপর যে বেয়ারা বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় পালটায় সে নটার সময় এসে ম্যানেজারকে রিপোর্ট করে। ম্যানেজার গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। দরজায় প্রচুর ধাক্কাধাক্কি করে, রিসেপশন থেকে বহুবার ফোন করেও যখন কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন বাধ্য হয়ে ম্যানেজার ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলেন। দরজা খুলতে দেখা গেল মিঃ সিং সোফায় বসে আছেন। তাঁর ঘাড়ের কাছে একটা ছোরা বিঁধে আছে। ম্যানেজার পার্ক স্ট্রিটের থানায় খবর দিতেই আমি এখানে চলে আসি।"

"আচ্ছা কখন খুন করা হয়েছে বলে আপনার ধারণা?"

"আমি হোটেলের বেয়ারাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি মিঃ সিং ভোর ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় বেড-টি দিতে বলে দিয়েছিলেন। বেড-টি দেওয়া হয়েছে সাড়ে পাঁচটায় আর ক্লিনার গেছে ধরুন সাতটা সাড়ে সাতটায়। সুতরাং ওই দু ঘন্টার মধ্যেই মিঃ সিং খুন হয়েছেন।"

"আচ্ছা ঐ দুঘন্টার মধ্যে কেউ কি মিঃ সিংয়ের কাছে এসেছিল?"

"না। রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেউ আসেনি।"

"হুঁ," বলে সোমনাথ চুপ করে রইল। তারপর ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাল কথা, আপনার হোটেলের টেলিফোন অপারেটারকে একটু জিজ্ঞেস করবেন কেউ আজ সকালে তাঁকে ফোন করেছিল কি না।"

"সার্টেনলি।" ম্যানেজার ফোন করলেন।

"না, সোমনাথবাবু। আজ কেউ মিঃ সিংকে ফোন করেনি। তবে ভাগ্যক্রমে কাল রাত্তিরে যে অপারেটর ছিল সে এখনও রয়েছে। আমি তাকে এখনি পাঠিয়ে দিতে বলছি যদি সে কোনও খবর দিতে পারে।"

একটু পরেই রাত্রের টেলিফোন অপারেটর এল। ম্যানেজারের কথার উত্তরে সে যা বলল তা হল যে গত কাল রাত্রি দশটা নাগাদ একজন লোক হরজিন্দার সিংয়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। লাইনটা সে সিংয়ের ঘরে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লাইনটা কেটে গিয়েছিল। ভদ্রলোক আর ফোন করেননি। না, সে ভদ্রলোকের নামও জিজ্ঞেস করেনি।

অপারেটর চলে গেলে সোমনাথ ইন্সপেক্টর দাসকে জিজ্ঞেস করল, "খুনের মোটিভ কি অনুমান করতে পেরেছেন?"

"না। তবে চুরি নয়। মিঃ সিংয়ের টাকা পয়সা কিছুই চুরি গেছে বলে মনে হয় না। সত্যিকথা বলতে কি খুনি ঘরের কোনও জিনিস নাড়াচাড়া করেছিল বলে মনে হয় না।"

"ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই।"

সকলে হরজিন্দার সিংয়ের ঘরে গেল। ইন্সপেক্টর পকেট থেকে চাবি বের করে ঘরের দরজা খুললেন। সোমনাথ আর ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকল। অমল আর ম্যানেজার দাঁড়িয়ে রইল।

অভিজাত হোটেলের সুসজ্জিত ঘর। ঘরের মাঝখানে সেন্টার টেবিল। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম বসানো। হরজিন্দার একটা সোফায় বসে আছেন। ঘাড়ে একটা ছোরা বসানো। চোখে-মুখে কোনও বিকার বা বিস্ময় নেই। সোমনাথ বুঝল যে হরজিন্দার কিছু বোঝবার আগেই আততায়ী তাকে আঘাত করেছে। ঘরের কোনও জিনিস কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে বলে সোমনাথের মনে হল না। সোমনাথ লক্ষ করল ঘরের দরজা আর সেন্টার টেবিলের মাঝখানে খবরের কাগজটা পড়ে আছে। সোমনাথ মৃতদেহর কাছে গিয়ে নিচু হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর সেন্টার টেবিলটার কাছে গিয়ে চায়ের সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করে বলল, "ইন্টারেস্টিং। চলুন ইন্সপেক্টর দাস, আমার যা দেখবার তা দেখা হয়ে গেছে।"

"কিছু হদিস করতে পারলেন।"

"পেরেছি বললে একটু বেশি বলা হবে। একটা অসঙ্গতি নজরে পড়ল। মিঃ সিং যে সোফাটায় বসে আছেন টি পট, মিল্ক পট আর কাপের হাতল ঠিক তার উলটো দিকে। এ ছাড়াও আর একটা অসঙ্গতি রয়েছে···মানে সামথিং রং···সেটা এখন ধরতে পারছি না;" সোমনাথ চুপ করে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সোমনাথ দেখল যে অমল একা দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের দেখে অমল বলল, "ম্যানেজার একটা দরকারে নীচে চলে গেছেন। আমাদের ওঁর ঘরে যেতে বলে গেছেন।"

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ওরা দেখল একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে খুব উত্তেজিতভাবে কী সব বলে যাচ্ছে। তার চোখ-মুখের ভাব আর জামাকাপড়ের অবস্থা দেখলে বোঝা যায় যে তাকে কেউ খুব মারধোর করেছে।

সোমনাথদের ঘরে ঢুকতে দেখে ম্যানেজার ছেলেটিকে বললেন, "ঠিক আছে তুমি এখন যাও ? আমি সবাইকে বলে দেব। কিছু হবে না।" ছেলেটি চলে গেল।

সোমনাথ বলল, "কী ব্যাপার।"

"দেখুন না যত বাজে ঝামেলা। এটি আমার এক বেয়ারার ছেলে। হোটেলে বোর্ডারদের ঘরে খবরের কাগজ দেয়। আজ ভোরে যখন কাগজ নিয়ে আসছিল তখন কয়েকজন লোক মিলে ওর সাইকেল কাগজ কেড়ে নিয়ে মারধোর করে মেটেবুরুজের কাছে একটা বাড়িতে আটকে রেখেছিল। ও কোনওরকমে ওদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে। আজ হোটেলে খবরের কাগজ দিতে পারেনি।"

ম্যানেজারকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সোমনাথ বলল, "আজকে ও হোটেলে খবরের কাগজ দিতে পারেনি ? শিগগির ওকে ডাকুন।"

ছেলেটি আসতে সোমনাথ বলল, "কী হয়েছিল বলো তো ?"

ছেলেটি যা বলল তা হল, সে যখন খবরের কাগজ নিয়ে আসছিল তখন চৌরঙ্গি আর সদর স্ট্রিটের মুখে একজন আধবুড়ো ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে একটা কাগজ দিতে বলেন। সে বলে যে তার বেশি কাগজ নেই। সেই কথা শুনেই সেই ভদ্রলোক খুব রেগে চিৎকার করতে শুরু করেন। তার চিৎকার চেঁচামেচিতে তখন কোথা থেকে জনাকয়েক লোক এসে কোনও কথা না বলে তাকে কিল চড় লাথি মারতে থাকে। তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। ওখানে আর কোনও লোক না থাকায় ও কিছুই করতে পারেনি।

"আচ্ছা তাদের কি তুমি পরে দেখলে চিনতে পারবে ?"

"হ্যাঁ, সেই আধবুড়ো লোকটিকে দেখলে চিনতে পারব। আর পরে যারা এসে মারধোর করছিল তাদের একজনকে চিনতে পারব। সে লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া।"

ছেলেটিকে বিদায় করে সোমনাথ ইন্সপেক্টর দাসকে বলল, "মিঃ সিংয়ের ঘরের মেজেতে খবরের কাগজটা পড়ে থাকাটাই দ্বিতীয় অসঙ্গতি। খুনি যদি খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর তুলে রাখত তাহলে ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ত না। যাই হোক, সবকিছু আমাদের তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে।"

পুলিশের গাড়িতে উঠে ইন্সপেক্টর দাসের প্রশ্নের জবাবে সোমনাথ বলল, "প্রথম অসঙ্গতির কথাটা তো আগেই আপনাকে বলেছি। মিঃ সিং যে সোফাটায় বসেছিলেন টি সেটটা ঠিক তার উলটো মুখ করে বসানো ছিল। মিঃ সিং চা খেয়েছিলেন। তা হলে কেন এমন হল ? এর উত্তর একটাই মিঃ সিং ওই চেয়ারটায় বসেননি। খুনি খুন করে তাঁকে ওই চেয়ারে বসিয়ে দেয়। কিন্তু খুনি খুন করার সুযোগ পেল কী করে ? মিঃ সিংয়ের চোখ-মুখে কোনও ভয়, আতঙ্ক বা বিস্ময়ের চিহ্ন ছিল না। সুতরাং যে ছদ্মবেশ ধরে খুনি এসেছিল সেটা তিনি আন্দাজই করতে পারেননি। কী সেই ছদ্মবেশ ? ম্যানেজারের কথায় বুঝতে পারলুম যে খুনি কাগজওলার ছদ্মবেশে এসেছিল। আর হরজিন্দার সিংও তাই সন্দেহ না করে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।"

ইন্সপেক্টর দাসকে হোটেল-ডি-লাক্সে নামিয়ে দিয়ে সোমনাথ পুলিশের গাড়ি নিয়ে গেল নারকেলডাঙার এক বস্তিতে। সেখান থেকে হরুকে নিয়ে রতনের ডেরায়। রতন সেখানে নেই। কাল রাত থেকে সে বাড়ি ফেরেনি। কোথায় গেছে জানা গেল না।

হোটেল-ডি-লাক্সের একটা ঘরের দরজায় টক টক করে টোকা পড়ল।

"কে ?"

"আমি ম্যানেজার। দয়া করে দরজাটা খুলুন।"

দরজাটা একটু ফাঁক হতেই সোমনাথ দরজায় এক প্রচণ্ড লাথি মারলে। দম করে দরজাটা খুলে গেল। টাল সামলাতে না পেরে অশোক দাসোয়ানি পড়ে গেল। সোমনাথ আর ইন্সপেক্টর দাস ঘরে ঢুকে দেখল একটা দৈত্যের মতো চেহারার কালো লোক বাথরুমে ঢোকবার চেষ্টা করছে।

কিছুদিন পরে সোমনাথ অমলের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। অমল লিখেছে তার মায়ের কথায় সে সোমনাথকে এই সামান্য উপহার পাঠাচ্ছে, সে যেন গ্রহণ করে। চিঠির সঙ্গে পিন দিয়ে আটকানো পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ডোঙরপুরে যাচ্ছে মহাজন ! কার মেয়েকে বিয়ে করতে ? ব্যাপারটা জানতে হচ্ছে !

এদিকে বরযাত্রীর দল গাঁ থেকে বেরিয়েছে । মাঝখানে বর ঘোড়ায় চড়ে, দু'পাশে পায়ে হেঁটে বরযাত্রীর দল ।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় সদাশিব । ঘোড়ার পিঠে কম্বল বাঁধে ।

ভাই সহস্রবুদ্ধি, এবার আমি যাই ।

আরে ! কোথায় ?

পাগড়ি বাঁধতে-বাঁধতে সদাশিব বলে

অনেক দূর । কিন্তু আবার আমি এই পথে ফিরে আসব । আবার দেখা হবে ।

আচ্ছা ।

এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল সদাশিব ... তারপর উত্তর মুখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ।

এরই মধ্যে বরযাত্রীরা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে । কিছুক্ষণের মধ্যেই সদাশিব তাদের ধরে ফেলল ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব ছৈ ছৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

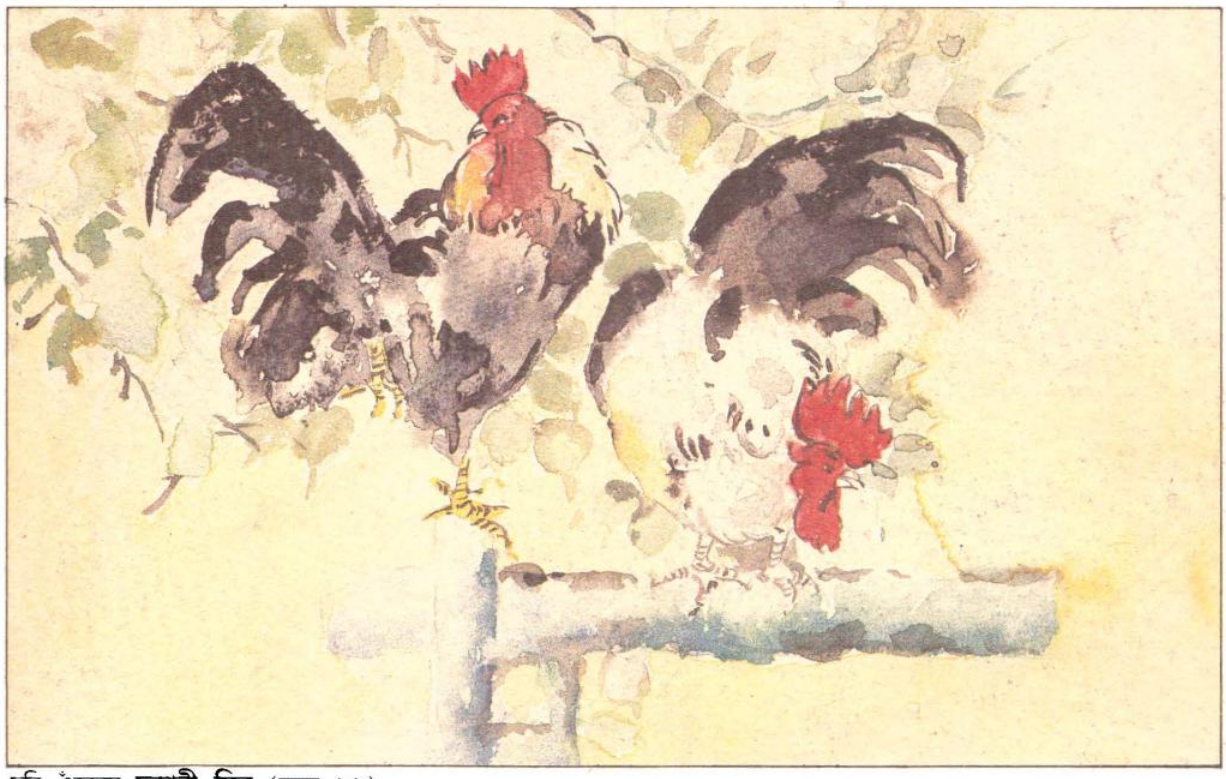

ছবি এঁকেছে **চন্দ্রানী মিত্র** (বয়স ১২)

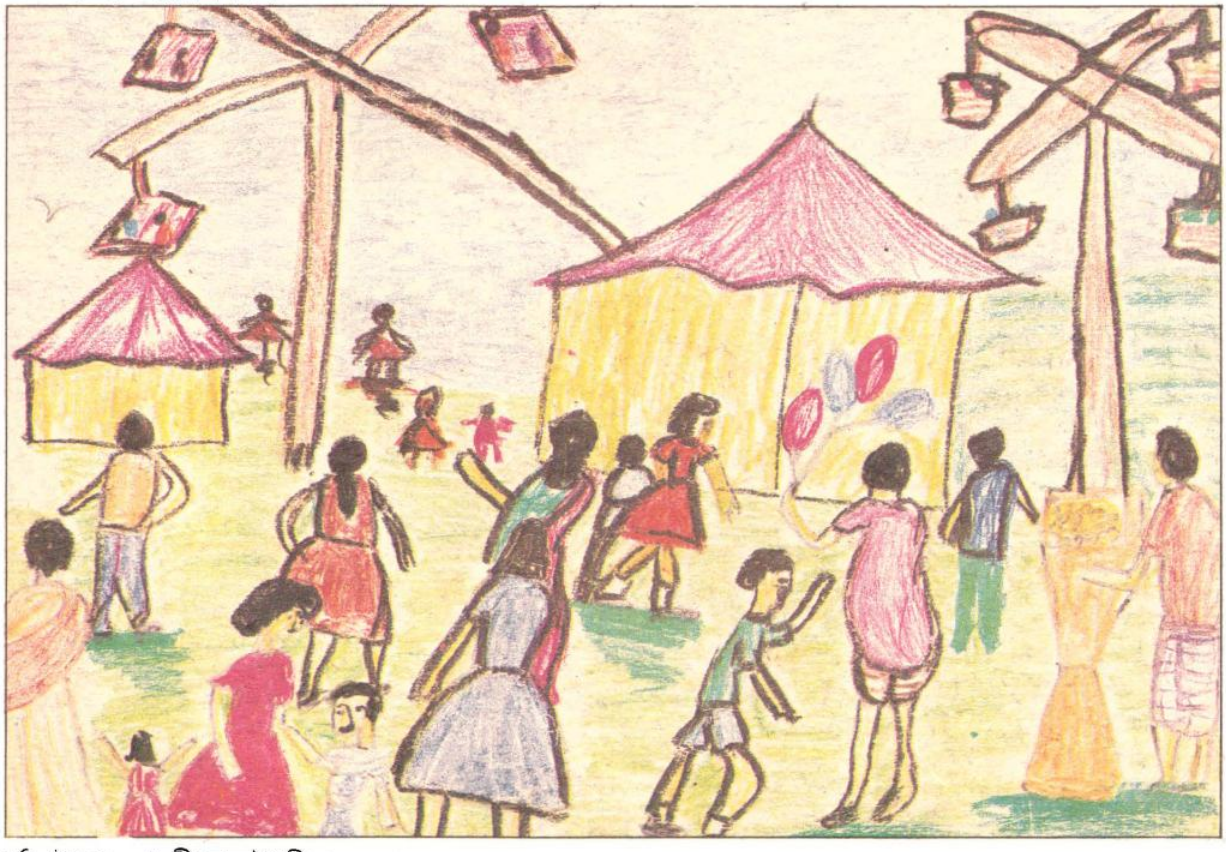

ছবি এঁকেছে **শ্রেয়সী রায়চৌধুরী** (বয়স ৬)

ল্যাকমে কসমেটিক সাবান
বিশেষ ত্বক মোলায়েমের অয়েলে সমৃদ্ধ

ত্বকের স্বপ্নময় লাবণ্যের জন্য.

অনুভব করুন অঙ্গ ঘিরে ল্যাকমে কসমেটিকের ক্রীমেভরা ফেনা, নিজেই বুঝবেন সুরভিত এই ফেনার জাতই আলাদা।

এইতো ত্বককে মোলায়েম করা বিশেষ তেলের আদরভরা পরশ, যা আপনার ত্বককে করে তোলে পেলব কোমল, লাবণ্যে ঢলঢল।

ল্যাকমে কসমেটিক সাবান।

প্রতি রমণীর কমনীয় ত্বকের স্বপ্ন আজ সার্থক।

Lakmé

Enterprise LL 16B

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে চা-বাগানে এসেছিল। কাছেপিঠে ডাকাতি হচ্ছে। রাত্রে দূরের পাহাড়ে সাংকেতিক আগুন জ্বলে। তার অর্থ জানে বুধুয়া-বুড়ো। সায়ন একটা সওয়ারহীন ঘোড়ায় উঠেছিল। ঘোড়াটা তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে নানা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। নদী পেরোবার সময়ে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠতে সায়ন ছিটকে পাড়ে পড়ে যায়। সেখানে যে-লোকটা তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচায়, সে বাংলা জানে। লোকটার পোষা-হনুমান সাপ ধরেছিল। সাপটা মরেছে। হনুমানকে নিয়ে লোকটা জঙ্গলে বেরিয়েছে। তারপর···

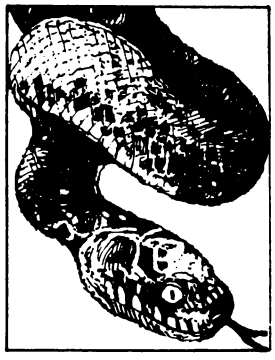

মাথার ওপর একটা বাজপাখি উড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সায়ন নীচের দিকে তাকাল। খাড়া এক পাহাড়ের ওপর এই গুহা। চট করে কোনও মানুষ ভাবতেই পারবে না এখানে কেউ থাকে। আর জানতে পারলেও কারও পক্ষে এখানে উঠে আসা সম্ভব নয়। কারণ এখান থেকে শুধু গাছের মাথাগুলোই দেখা যাচ্ছে। অনেক গাছ একসঙ্গে থাকায় সেদিকে তাকালে সবুজ মাঠের কথা মনে হয়।

সায়নের পায়ে এখন যদিও যন্ত্রণা হচ্ছে না, কিন্তু সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিল না। যদি পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কী হবে ? কথাটা ভাবতে গিয়েই সে হেসে ফেলল। ভবিষ্যতের কথা সব সময় ভাবলে হয়তো সাবধান হওয়া যায়, কিন্তু সব কিছু কি নিয়মে চলে ? তার কি এই আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের মাথায় খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল ? অতএব যা হবার তা হবে। এই পা নিয়ে সে মোটেই ভাববে না।

এই সময় সে হুপ-হুপ শব্দ শুনতে পেয়েই চেয়ে দেখল, ইন্দ্র একটা দড়ির সিঁড়িগোছের কিছু একটা গাছের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়ে ওর দিকে সামান্য ভেংচে নেমে গেল ডাল ধরে। গাছটা বেশ নীচে। দড়িটা নেমে গেছে পাহাড়ের ওপর গুহার পাশ দিয়ে। অর্থাৎ এই দড়ি বেয়ে লোকটা নীচে নামে। এবং নামার পর ইন্দ্র সেটাকে ওপরের গাছে তুলে দিয়ে আসে, যাতে আর কেউ সেটাকে ব্যবহার না করতে পারে। ব্যাপারটার মধ্যে বেশ মজা আছে। সায়নের মনে পড়ল টারজানের কথা। টারজান তো এই রকম পাহাড়জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বনমানুষ সঙ্গে নিয়ে। তফাত শুধু এই যে, লোকটার বয়স হয়েছে এবং সে ফুলপ্যান্ট ও জুতো পরে।

হাওয়ার তেজ বাড়ছিল। সায়ন আর সোজা হয়ে গুহার দেওয়াল ধরে দাঁড়াতে পারছিল না। তার ভয় হল, আর-একটু জোরে হাওয়া বইলে তাকে ছিটকে ফেলবে এখান থেকে। সে ধীরে-ধীরে সরে এল। লোকটা চলে গেল, ওর সঞ্চয়ের ফলমূল শেষ হয়ে গেছে, তাই নিয়ে আসা দরকার। যেন থলে নিয়ে বাজার করতে যাওয়ার মতো ব্যাপার। এখানে কোনও বাজার নেই, মানুষই বোধহয় থাকে না। এই জঙ্গলের মধ্যে দোকান থাকা অসম্ভব। এখানকার গাছে কি খাবার মতো ফল পাওয়া যায় ? আর সেই ফল এবং হরিণের পোড়া মাংস খেয়ে লোকটা বেঁচে আছে ? নিশ্চয়ই তাই।

তা হলে লোকটা একা থাকে না। ওর সঙ্গী ইন্দ্র এবং ঘোড়াটা। ওই ঘোড়া কী করে তাদের বাগানে চলে গিয়েছিল ? যে পথ ভেঙে ওরা এখানে এসেছে, তাতে দূরত্বটা কম নয়। সে ঝুঁকে নীচটা দেখতে চাইল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গাছপালা সব কিছু আড়াল করে রেখেছে। লোকটা ঘোড়াটাকে পেল কোত্থেকে ? অমন শিক্ষিত ঘোড়া !

সায়ন ধীরে-ধীরে চলে এল সেই দিকে, যেদিকে লোকটা তাকে নিষেধ করেছিল যেতে। আর তখনই সে অবাক হয়ে গেল। সামনের চাতালের মতো অংশে বেশ বড়-বড় পাথর সাজানো আছে। সাজানো বলে মনে হল, কেননা ওই বড় পাথরগুলো চমৎকার আড়ালের কাজ করছে। প্রকৃতি কি এইভাবে পাথর রেখে দেবে ? আর সেই পাথরের ওপাশেই খাদ।

সায়ন ধীরে-ধীরে একটা পাথরের গায়ে হাত রেখে দাঁড়াল। ওপাশে কিন্তু অনন্ত শূন্য নেই। পাহাড় এদিকে বেশ উঁচু। আর সেই পাহাড়ের কিছুটা জায়গা সমান, এবং সেখান দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে দু'পাশে। পিচ বা সুরকির পথ নয়, নেহাতই পায়ে চলা-পথ। কিন্তু বেশ চওড়া। গুহা থেকে জায়গাটার দূরত্ব সত্তর-আশি গজ হবে। ওখান থেকে চট করে কেউ এই গুহায় আসতে পারবে না, কারণ মাঝখানে ঘন জঙ্গলের বাধা রয়েছে। তা ছাড়া, সমস্ত পাহাড়ি জায়গাই যখন এক রকম, তখন অকারণ কেউ এখানে আসতে যাবেই বা কেন ? তবু যাওয়া-আসার পথ ঢের বেশি সোজা হত এইদিক ব্যবহার করলে। অথচ লোকটা নামা-ওঠা করে পেছন দিক দিয়ে। এদিকে এমন চিহ্ন রাখতে চায় না, যাতে বোঝা যায় কেউ এখানে বসবাস করে। কেন ? তা হলে কি ওই পথ দিয়ে লোকজন যাওয়া-আসা করে ? এই জঙ্গলে তা হলে কি মানুষজন থাকে ? সায়ন কিছুই বুঝতে পারছিল না। এই বন্যজন্তু এবং শ্বাপদে ঘেরা ভুটানি জঙ্গলে মানুষের কথা কল্পনা করা যায় ? আর তখনই তার খেয়াল হল সেই অশ্বারোহীদের কথা। সেই নিষ্ঠুর মুখের মানুষগুলো তো ঘোড়ায় চেপে এই সব পাহাড়ি জঙ্গলেই চলে এসেছিল। তারাই কি ওই পথে যাওয়া-আসা করে ? তাদের সঙ্গে এই লোকটির কি কোনও যোগাযোগ আছে ? সায়ন মনে করে দেখল, লোকটার ভাবভঙ্গি রহস্যজনক। এবং কথাবার্তায় বেশ নেতা-নেতা ছাপ আছে। তাদের স্কুলে একটা ইংরেজি ছবি দেখিয়েছিল। কাউবয়দের নিয়ে গল্প। তাদের নেতার সঙ্গে যেন এই লোকটার মিল আছে।

পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সায়নের মনে পড়ল সেই

অগ্নিচিহ্নের কথা। এখানে যদি মানুষ না থাকে, তা হলে সেই সাংকেতিক আগুন জ্বালবে কে? বুধুয়া-বুড়ো যা দেখে শয়তানের ভয় পেয়েছিল—সেগুলোর পেছনে কি মানুষ আছে? সেই মানুষগুলো, যারা হাইওয়েতে ডাকাতি করছে, চা-বাগানে হামলা চালিয়েছে, সেই মানুষগুলোর সঙ্গে এই লোকটার যদি সংযোগ থাকে? সায়ন ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে? সে কি আর কখনও কুমুদিনীর কাছে ফিরে যেতে পারবে?

এখন এই দিনের বেলাতেও পাহাড় এবং জঙ্গলটাকে কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে। নীলচে একটা কুয়াশায় মাখামাখি চারধার। যদি সত্যি শয়তান বলে কেউ থাকে, তবে তার এই জায়গাটাকে দারুণ পছন্দ হবার কথা। হঠাৎ শরীর শিরশির করে উঠল সায়নের। সেই কালসাপ দুটোর মৃত্যুর সঙ্গে শয়তানের সম্পর্ক ছিল বলে মত দিয়েছিল বুধুয়া-বুড়ো। তাই কি শয়তান সাপ পাঠিয়েছিল এখানে? ইন্দ্র যদি না দেখত তা হলে কী হত বলা যায় না। শয়তান না মানুষ, তাই নিয়ে ধন্দ থাকলেও সায়ন খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে ধীরে-ধীরে ফিরে এল গুহার মুখটায়।

এখানে হাওয়ার দাপট নেই। শোঁ-শোঁ বাতাস আঘাত করছে ওপাশে। এত জোরে বাতাস বইছে, তবু গাছের মাথাগুলো একটুও কাঁপছে না। ওরা রয়েছে নীচে, বাতাস বইছে অনেক ওপর দিয়ে। সায়নের আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল। এই পরিষ্কার চাতালে চমৎকার ঘুমোনো যায়। কিন্তু সাহস হল না ওর। যদি সাপের সঙ্গীটা এবার উঠে আসে। তার মনে হল লোকটা কেন ফিরতে দেরি করছে। কিছু ফল নিয়েই তো চলে আসতে পারে। তা হলে তাকে এখানে একা-একা থাকতে হয় না। লোকটা যে-ই হোক না কেন, ও এলে তবু কথা বলা যায়, সাহস বাড়ে। এমন কী, ইন্দ্রটা থাকলেও হত! সায়নের এবার শীত-শীত করছিল। অথচ এখন তো চা-বাগানে দারুণ গরম। দিনরাত ধুলো ওড়ে। সবাই মুখিয়ে আছে কখন বর্ষা আসবে!

সায়ন গুহার ভেতরে ঢুকল। জায়গাটা সত্যি নিরাপদ। হাওয়া ঢোকে না, শীত বা গরম নিশ্চয়ই কম লাগে। চারধারে শক্ত পাথরের দেওয়াল, ছাদ। যেন কোনও নিপুণ শিল্পী খোদাই করে তৈরি করে দিয়েছে লোকটার জন্যে। দেওয়াল ধরে মাটিতে বসতে গিয়েও মত পালটাল সে। গুহার ভেতরটায় কী আছে? যদিও বেশি দূর আলো যাচ্ছে না, কিন্তু একেবারে ঘুটঘুটে তো মনে হচ্ছে না এখন। সে এক-পায়ে আরও এগিয়ে চলল। একটু যেতেই মনে হল, গুহার মেঝে সমতল নয়। ভেতর দিকটা বেশ ঢালু। এবং দু'পাশের দেওয়ালটা সরু হয়ে এসেছে। সে সাবধানে তাকাল। ছায়াঘন গুহাটায় চোখ সইয়ে নিতে একটু সময় লাগল। এবং তখনই সে দেখতে পেল, গুহার গায়ে একটা ব্যাগ ঝোলানো। তার নীচে কয়েকটা কাঠের পাত্র। তাতে সম্ভবত খাবার এবং জল ঢাকা। আর একটু ওপাশে স্লিপিং ব্যাগ জাতীয় কিছু গুটিয়ে রাখা হয়েছে। তার মানে লোকটি এখানেই ঘুমোয়। এবং ওই ব্যাগটিই ওর একমাত্র সম্পত্তি। সায়ন আর একটু এগিয়ে গেল। ঝিরঝির বাতাস ঢুকছে গুহায়। সেটা আসছে এই পেছনের দিক দিয়েই। এবং তখনই গুহার শেষ প্রান্ত দেখতে পেল। ছোট্ট একটা ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে তাকালে নীচের গাছ তো বটেই, নদীটাকেও দেখা যায়। সিনেমার ছবির মতো, দুটো গাছের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া জল সুন্দর চোখে আসে। সায়ন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। ওই নদীটায় সেই ভয়ঙ্কর জীবটি বাস করে। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছে সে। ভাগ্যিস ঘোড়াটা লাফিয়ে তীরে উঠেছিল। কিন্তু এই পাহাড়ি জঙ্গলের নদীতে ওই রকম কোনও প্রাণী বাস করতে পারে? কুমির? সায়ন ভাবতে পারছিল না।

শেষ প্রান্ত থেকে সে আবার ফিরে এল। অনেক হয়েছে, এবার তার ঘুম পাচ্ছে।

দেওয়াল ধরে-ধরে ফিরে আসার সময় সায়নের চোখ পড়ল ব্যাগটার ওপর। ওই ব্যাগে কী আছে? লোকটা যদি অশ্বারোহীদের নেতা হয়, তা হলে তাকে যেমন করেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। স্কুলে মিস গল্প বলেছিলেন এক ধরনের নিষ্ঠুর মানুষের। তারা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে রেখে চাপ দিয়ে বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা আদায় করে থাকে। এই লোকটি সেই প্রকৃতির কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু সেটা জানা যেতে পারে ওর ব্যাগ ঘাঁটলে। না বলে অন্যের জিনিস দেখা নিশ্চয়ই অপরাধ, কিন্তু এখন তো এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। ব্যাগটা পুরনো, খুবই পুরনো। ত্রিপল বা ওই ধরনের কিছুতে তৈরি খাকি রঙের শক্ত ব্যাগ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্বিধা কাটিয়ে উঠল সায়ন। তারপর এক হাতে সেটাকে নামাতে গিয়ে দেখল বেজায় ভারী। তার বুক ঢিপঢিপ করছিল। এই সময় যদি লোকটা উঠে আসে ওপরে এবং তাকে এই অবস্থায় দেখতে পায়?

দ্রুত হাত চালাল সায়ন। কিছু ভাল কিন্তু খুব পুরনো জামা-প্যান্ট। একটা ডায়েরি। ডায়েরিটা খুলল সায়ন। প্রথম পাতায় সুন্দর বাংলা অক্ষরে লেখা সুধাময় সেন। ডায়েরির পরের পাতার লেখাগুলো এই আলোয় স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে না। সে ওটাকে রেখে দেবার আগে দেখল তারিখটা। বাইশে এপ্রিল, উনিশশো তেতাল্লিশ। সেই দিনকার কথা লিখেছে লোকটা, যার নাম সুধাময় সেন। হকচকিয়ে গেল সায়ন। সুধাময় সেনের বয়স কত?

এর পরেই হাতে ঠেকল একটা শক্ত কাগজ। সায়ন সেটাকে বের করে অবাক হয়ে গেল। লম্বায় দুই ইঞ্চি, চওড়ায় বড়জোর ইঞ্চি দেড়েক একটা পিচবোর্ডের ওপর ছবিটাকে আঠা দিয়ে সেঁটে রাখা হয়েছে। ছবিটাকে সে চেনে, খুব ভাল করে চেনে। না, ভুল হল, ছবির মানুষটিকে সে জানে, কিন্তু তার এই ছবিটি সে কখনও দ্যাখেনি। একটা খবরের কাগজ বা ওই জাতীয় কিছু থেকে ছবিটাকে কাটা হয়েছে।

সায়ন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না এই ছবি সুধাময় সেনের ব্যাগে আসবে কেন? এই রকম জীর্ণ হয়ে যাওয়া ছবি? দেখলেই বোঝা যায় কাগজটার রঙ জ্বলে গেছে। সায়ন এই ছবির মানুষটির গল্প অনেক পড়েছে। ওর কথা শুনলে বুক ভরে যায়! হঠাৎ সচেতন হতেই সায়ন ছবি এবং অন্যান্য জিনিস ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ব্যাগটাকে আবার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই একটা চিৎকার শুনতে পেল। চিৎকারটা মানুষের, সুধাময় ফিরে এসেছেন। চিৎকার করে ইন্দ্রকে ডাকছেন।

দ্রুত ফিরে আসতে গিয়ে জখম পা অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতে

ফেলতে গিয়েই সামলে নিল সায়ন। সে যখন গুহার মুখটায় চলে এসেছে, ঠিক তখনই সুধাময় সেনকে দেখতে পেল। একটা দড়ির ব্যাগে অনেকগুলো ফল নিয়ে সুধাময় ওর দিকে তাকিয়ে। একটু যেন জরিপ করে নিচ্ছেন। তারপর বললেন, "কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?"

সায়ন মাথা নাড়ল, "না।"

"কী করছিলে এতক্ষণ ?"

"কিছুই না।"

"গুহার ওপাশটায় যাওনি তো ?"

সত্যি কথাটা বলতে গলা কাঁপল। অথচ মিথ্যে কথা বলতে সাহস এবং ইচ্ছে হল না। সে নীরবে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

সঙ্গে-সঙ্গে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সুধাময় সেনের। কঠোর গলায় বললেন, "আমি অবাধ্যতা একদম পছন্দ করি না। প্রত্যেকটি মানুষের ডিসিপ্লিন মানা উচিত এবং আদেশ মান্য করা প্রয়োজন। তুমি যদি আবার আমার কথার অবাধ্য হও তাহলে..."

সায়ন করুণ গলায় বলল, "আমি অবাধ্য হবার জন্যে যাইনি।"

"তা হলে কেন গিয়েছিলে ?"

"ঘুরতে-ঘুরতে কৌতূহল হল।"

"কৌতূহল ! কৌতূহল দমন করতে শেখো। তোমাকে কেন ওদিকে যেতে নিষেধ করেছি তা জানো ? সেটা জানতে কৌতূহল হয় ?"

সায়ন কিছু বলল না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

সুধাময় হাতের জিনিস মাটিতে নামিয়ে গুহার মুখটায় ফিরে গেলেন, "আগে এই পাহাড় জঙ্গল ছিল খুব শান্ত, নির্জন। কোনও ঝামেলা ছিল না। জঙ্গলে থাকতে গেলে বন্যজন্তুর নিয়মকানুন জানলেই চমৎকার বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু সম্প্রতি..." কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন সুধাময় সেন। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে বললেন, "আমায় জিজ্ঞাসা না করে কখনও ওপাশে যেও না। অযথা বিপদ ডেকে এনে কী লাভ ?"

সুধাময় সেন বাইরে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র ইন্দ্র লাফিয়ে গুহায় ঢুকল। সায়ন হনুমানটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। ওর হাতে এক ছড়া কলা। পাকা, পুরুষ্টু। সায়নের সামনে এসে সে কলাগুলোকে এগিয়ে ধরল। হনুমান বাঁদর কলা খেতে ভালবাসে, কিন্তু অন্য কাউকে সেটা খাওয়ায় বলে কখনও শোনেনি সায়ন। সে একটা পাকা কলা ছিঁড়ে খেতে গিয়ে সামলে নিল। তারপর আর-একটা কলা ছিঁড়ে খোসা ছাড়িয়ে ইন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিল। ইন্দ্রের চোখ খুশিতে ভরে উঠল। সে ছড়াটা নীচে রেখে দিয়ে কলাটা নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

সায়ন কলাটায় কামড় দিল। অত্যন্ত মিষ্টি, সুস্বাদু। সে ইন্দ্রের দিকে একটা হাত বাড়াতেই ও এক পা পিছিয়ে বসল। সায়ন বুঝল, ভাব হতে বেশি দেরি হবে না। সে আবার গুহার ভেতরটা দেখল। ব্যাগটা আবছা দেখা যাচ্ছে। সুধাময় সেন যদি জানতে পারেন, সে ওই ব্যাগ খুলেছিল ! লোকটা খুব কড়া ধাতের। আর তখনই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই মানুষটাও তো খুব শক্ত ধাতের ছিলেন বলে শুনেছে সে। তার ছবি কেন থাকবে সুধাময়ের ব্যাগে ! পুরো সামরিক পোশাকে সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন রেখে দিয়েছেন সুধাময় সেন এই গুহায় ? (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

ধাঁধা

ছোট্টকার কাছে যা নিয়ে যাবে, তাই নিয়েই বানাবে বোকা বানানোর ধাঁধা। আমি তো পারতপক্ষে অঙ্ক-ইংরেজির খাতা দেখাই না ছোট্টকাকে। নিজে-নিজেই যা পারি করি। কিন্তু সেদিন একটা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক বারবার করেও যখন মিলছে না কিছুতেই, শেষ পর্যন্ত যেতেই হল ছোট্টকার কাছে।

ছোট্টকা অবশ্য তক্ষুনি-তক্ষুনি ধাঁধা বানিয়ে দিল, এমন নয়। তবে কিনা, একটা অঙ্ক শেখাতে গিয়ে দশ-দশটা অঙ্ক করিয়ে নিল আমাকে দিয়ে। ছাড়াছাড়ি নেই কোনও।

অবশ্য, একটা লাভ হয়েছে। ঐকিক নিয়মের অঙ্ক দেখলে আগে যেমন গায়ে জ্বর আসত আমার, এখন আর আসে না। বরং ক্লাসে সেদিন মাস্টারমশাই যখন একটা অঙ্ক দিয়ে বললেন, দেখি কে আগে উত্তর মেলাতে পারে, আমার উত্তরই সব থেকে আগে হয়ে গেল। ফলে খাতায় পেলাম, 'ভেরি গুড'।

ছোট্টকা এলে সেটা দেখালাম। আর তার পরেই নতুন ধাঁধা হিসেবে পেলাম একটা ঐকিক নিয়মের অঙ্ক। সেটাই এবার দিচ্ছি তোমাদের। না না, এটা স্রেফ অঙ্ক নয়, বেশ ধাঁধালো ব্যাপার।

প্রথম ধাঁধা ॥ দুটো হাঁস যদি দু'দিনে দুটো ডিম পাড়ে, তাহলে ছ'টা হাঁস ছ'দিনে পাড়বে ক'টা ডিম ?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা ১ ফুট বাই ১ ফুট বাই ১ ফুট গর্তে কতটা মাটি থাকবে বলতে পারো ?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

দ্যাহামশবিদ

গতবারের উত্তর ॥ (১) DINED ও ATE, RIP ও TEAR,SLOPES ও HILLS. (২) যখন LIFE-এর শেষে থাকে। (৩) SEE.

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫			■	
	■		■		■	
	■	৬	৭		■	
■	৮	■		■	৯	■
■	১০					■
১১		■		■	১২	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) তিন অক্ষরেও যা, প্রথম দু' অক্ষরেও তা-ই। (৩) ভেলা। (৫) রক্তবর্ণ। (৬) গরমকালের আরাম, শুতে-বসতে লাগে। (১০) পায়চারি। (১১) সংগীতে নিম্নস্বর। (১২) অহংকার।

উপর-নীচ : (১) বিষ্ণুর অবতারবিশেষ। (২) কলকাতা একদিন কোন্ অপ্সরা হবে ? (৩) প্রধান ব্যক্তি। (৪) আমগাছ। (৭) দুর্বৃত্ত। (৮) হিংস্র জন্তু। (৯) প্রাচীন ভারতের একজন দার্শনিক মুনি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বে	কা	র	■	চা	ম	চ
ত	ম	সা	■	বি	রূ	প
■	ধে	■	■	■	দ্যা	■
■	নু	র	জা	হা	ন	■
আঁ	■	■	ম	■	■	ব
তা	■	মা	রু	তি	■	লা
ত	ন্দ্রা	■	ল	■	ঢা	কা

রঞ্জন

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য প্রথমে এক ডজন টুথপিক বা ব্যবহৃত দেশলাই-কাঠি লাগবে। কাঠি বারোটাকে নীচের ছবির মতো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখো বন্ধুদের সামনে—

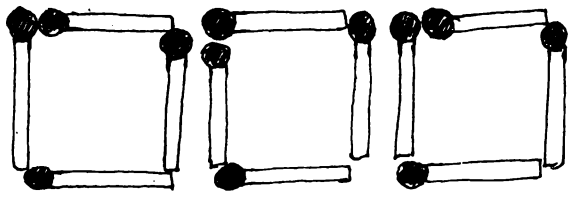

তিনটে গোল্লার মতো দেখাচ্ছে তো ? বেশ। এবার একটা মন্ত্র বলো বন্ধুদের। বলা হচ্ছে কী করতে হবে তাদের। মন্ত্রটা হল—'তুলবে দুই, থাকবে দুই/ নতুন করে সাজিয়ে থুই।' কী মানে বোঝা গেল ? বেশ ভেঙে বলি।

অর্থাৎ, দুটো কাঠি সরবে ছবিটা থেকে, বাকি কাঠিগুলো নতুন করে সাজানো হবে, শেষ পর্যন্ত টেবিলে থাকবে পড়ে—'দুই'।

কীভাবে থাকবে ?

আরে বাবা, সেটাই তো খেলা। বন্ধুরা তো সেটাই চেষ্টা করবে। তবে কিনা, তারা যখন হাল ছেড়ে দিয়ে তোমাকেই বলবে, সমাধানটা হাতে-কলমে করে দেখাতে, তখন যাতে অপ্রস্তুত হতে না-হয়, তার জন্য তো ব্যবস্থা একটা দরকার।

সে-ব্যবস্থা কি আমাকেই করে দেখাতে হবে ? দেখাব নিশ্চয়ই। কিন্তু কথা রইল, নিজেরা না-পারলেই কেবল উত্তরটা দেখবে। কেমন ?

দশটা কাঠিকে নতুন করে সাজাতে হবে টেবিলে, নীচের ছবির মতন। তাহলেই 'দুই' পড়ে থাকবে।

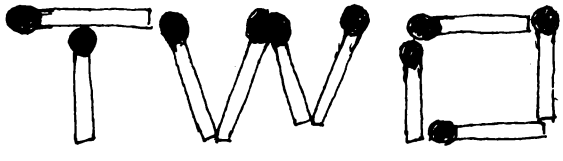

দুটো কাঠি তো আগেই সরে গেছে। বাকি দশটা দিয়ে 'দুই' বানাও, ঠিক ওপরের ছবির মতন।

মজারু

হাসিখুশি

"আমি অঙ্কে বেশি নম্বর পেলে মাস্টারমশাই একটা ভাল প্রাইজ দেবেন বলেছেন। কম নম্বর পেলে কী দেবেন বলো তো ?"

"সারপ্রাইজ নিশ্চয়ই।"

"এই যে মাছ-শিকারি, আজ বোধহয় অনেকগুলো শিকার পেলে ?"

"অনেক। চল্লিশটা।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ, দুটো মাছ আর আটত্রিশটা মশা।"

"এখন আপনাকে যে তারাটা দেখাব, তার আলো পৃথিবীতে আসতে দশ বছর সময় লাগে।"

"মাফ করবেন। অতদিন অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার নেই।"

"আপনার চিকিৎসাতে আমি খুব লাভবান হয়েছি ডাক্তারবাবু।"

"কিন্তু আপনি কখনও আমার রোগী ছিলেন বলে তো মনে হচ্ছে না !"

"আমি কেন ? আমার জ্যাঠামশাই ছিলেন। তাঁর সব সম্পত্তি আমিই পেয়েছি কিনা।"

"নতুন চাকরিতে জয়েন না করেই চলে এলে যে ! কী ব্যাপার ?"

"কী করব ? অফিসের গেটে নোটিশ ঝুলছে 'ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড'।"

"সত্যি করে বলো তো বুবাই, এই অঙ্কগুলো তোমার বাবা করে দিয়েছেন ?"

"না, বাবা চেষ্টা করেছিলেন ; পারেননি। তাই দিদি করে দিয়েছে।"

ছবি : দেবাশিস দেব

বুড়ো আঙুলের কথা

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : ডাক্তার ওয়াটসনের চেম্বারে সাতসকালেই রুগি এসেছে। নাম ভিক্টর হেদারলি। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ভদ্রলোক সারা রাত ট্রেন-জার্নি করেছেন। হাতের ব্যাণ্ডেজ খুলতে দেখা গেল, বুড়ো আঙুল কাটা। শার্লক হোম্‌সকে তিনি জানালেন কর্নেল স্টার্ক নামে একটি লোকের কথায় তিনি এফোর্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা হাইড্রলিক মেশিন সারাতে হবে। এফোর্ডে কর্নেল স্টার্ক তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে উঠিয়ে পাড়াগাঁর একটা বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়িতে যে ভদ্রমহিলার দেখা মেলে, তিনি একান্তে পেয়ে হেদারলিকে বলেন, "পালান।" মেশিন দেখে বোঝা যায়, কুলারস আর্থের যন্ত্র এটা নয়। কর্নেল স্টার্ককে সে-কথা বলতে তিনি মেশিনঘরের মধ্যে হেদারলিকে বন্দী করেন। দরজায় তালাচাবি। তারপর···

হেদারলি বলে যেতে লাগলেন তাঁর কাহিনী। "হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা শব্দ আমার কানে এল। শব্দটা কানে যেতেই ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। মেশিনটা কেউ চালু করে দিয়েছে। হাইড্রলিক প্রেশারের সিলিণ্ডারগুলো হিসহিস শব্দে চালু হয়ে গেছে। বুঝলুম, কর্নেলই মেশিনটা চালিয়ে দিয়েছে। মেজের ওপরে তখনও লণ্ঠনটা জ্বলছিল। লণ্ঠনটা এখানে নামিয়ে রেখে লোহার গামলায় জমে থাকা গুঁড়োগুলো পরীক্ষা করতে গিয়েছিলুম। সেই কম আলোতে আমি দেখতে পেলুম যে ঘরের কালো ছাদটা খুব আস্তে-আস্তে নেমে আসছে। এই যন্ত্রটা যে কী ধরনের অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করতে পারে আমার চাইতে ভাল করে বোধহয় কেউ জানে না। এর চাপে এক মিনিটের মধ্যে আমি তালগোল পাকিয়ে একটা জড়পিণ্ড হয়ে যাব। দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি কর্নেলকে দরজা খুলে দেবার জন্য বারবার অনুনয়বিনয় করতে লাগলুম। কিন্তু মেশিনের শব্দে আমার সব অনুরোধ চাপা পড়ে গেল। এখন ঘরের ছাদটা আমার মাথা থেকে মাত্র ফুট দুই-তিন ওপরে। আমি হাত দিয়ে যন্ত্রটাকে ছুঁতে পারছিলুম। হঠাৎ আমার মনে হল যে, আমার মৃত্যু-যন্ত্রণাটা কত বেশি হবে, সেটা নির্ভর করবে কোন্ অবস্থায় মেশিনটা আমাকে পিষে ফেলবে তার ওপরে। আমি যদি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকি তো মেশিনটা আমার মেরুদণ্ডটা গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবে। যন্ত্রণাটা কম হবে যদি আমি চিত হয়ে শুয়ে থাকি। কিন্তু চিত হয়ে শুয়ে মেশিনটা একটু-একটু করে নেমে আসছে দেখেও কি স্থির হয়ে থাকতে পারব ? ছাদটা আরও খানিকটা নেমে এসেছে। এখন আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। হঠাৎ আমার মনে বাঁচবার আশা হল। আমার চোখ পড়ল দেওয়ালের ওপর।

"আগেই বলেছি যে, ঘরের ছাদ আর মেজেটা লোহার কিন্তু দেওয়ালগুলো সব কাঠের। হঠাৎ মনে হল কাঠের দেওয়ালের মাঝখানে একটা ফুটো দিয়ে যেন আলোর ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছে। ফুটোটা একটু-একটু করে বড় হতে লাগল। প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, সেখানে কোনও দরজা আছে। পরের মুহূর্তেই আমি কোনও রকমে এক লাফে ঘরের যেদিক দিয়ে আলোর রেখা আসছিল সেদিকে গিয়ে পড়লুম। দরজার কাছে পৌঁছেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আর প্রায় তখনই ঘরের ভেতরে লণ্ঠনটা ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেল আর লোহায় ধাক্কা লাগবার শব্দ কানে এল। বুঝতে বাকি রইল না অল্পের জন্যেই এ যাত্রায় বেঁচে গেলুম !

"যখন জ্ঞান হল তখন দেখলুম কে যেন আমার হাত ধরে ঝাঁকানি দিচ্ছে। চোখ মেলে তাকাতে দেখলুম যে একটা সরু বারান্দায় শুয়ে আছি। আর একজন ভদ্রমহিলা ঝুঁকে পড়ে আমাকে দেখছেন। ভদ্রমহিলার হাতে একটা মোমবাতি। মোমবাতির আলোয় ভদ্রমহিলাকে চিনতে পারলুম। আমার সেই অপরিচিতা হিতৈষিণী, যিনি গোড়াতেই আমাকে পালাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

"ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, 'উঠুন, উঠুন। ওরা এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে। আর আপনি যে ও ঘরে নেই সেটা টের পেয়ে যাবে। আর একটুও দেরি করবেন না। দয়া করে তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে আসুন।' এবার কিন্তু আমি তাঁর কথার অবাধ্য হলুম না। কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর তাঁর পিছনে পিছনে সেই বারান্দা বরাবর ছুটতে লাগলুম। বারান্দার শেষে একটা সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম। সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পেলুম একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দাতে পৌঁছতেই চেঁচামেচির শব্দ কানে এল। কারা যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। মনে হল ওপরতলা থেকে কেউ যেন কিছু বললে। তার কথায় আর একজন সাড়া দিলে। আমার মনে হল যে, দ্বিতীয় লোকটি আমরা যে তলায় রয়েছি সেই তলাতেই কোথাও আছে। আমার গাইড ভদ্রমহিলা যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। ঠিক কী করা উচিত হবে বুঝতে না পেরে তিনি আমাকে একটা ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন। সেটা একটা শোবার ঘর। ঘরের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ছে।

" 'এই হচ্ছে আপনার বাঁচাবার একমাত্র রাস্তা। জানালাটা একটু উঁচু তবুও মনে হয় আপনি এখান থেকে লাফিয়ে পালাতে পারবেন।'

"ভদ্রমহিলা যখন কথা বলছিলেন তখনই আমার নজর গিয়ে পড়েছিল বারান্দার উল্টো দিকে। একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। দেখতে পেলুম যে, কর্নেল লাইসেণ্ডার স্টার্ক এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে মাংসওলারা যে রকম ভারী দা মাংস কাটবার জন্যে ব্যবহার করে, সে রকম একটা দা নিয়ে ছুটে আসছে। আমি আর অপেক্ষা না করে এক দৌড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে জানালাটা খুলে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। বাগান থেকে জানলাটা কম করে ফুট তিরিশ উঁচু হবে। চাঁদের আলোয় পরিপাটি করে রাখা বাগানটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

চারদিক নিস্তব্ধ। আমি জানলার ফ্রেমটা ধরে দাঁড়ালুম। সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিলুম না। ভাবলুম যে, যদি শয়তানটা ভদ্রমহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তো আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। গুণ্ডাটা ভদ্রমহিলাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আটকাবার জন্যে ভদ্রমহিলা লোকটাকে দু' হাত দিয়ে জাপটে ধরলেন।

ভদ্রমহিলা ইংরেজিতে বললেন, 'ফ্রিৎস, তোমার কি মনে নেই গতবার তুমি আমাকে কী কথা দিয়েছিলে ? তুমি যে বলেছিলে এ-কাজ আর তুমি করবে না। এই ভদ্রলোক কোনও কথা কাউকে বলবেন না। আমি কথা দিচ্ছি যে, আজ রাত্তিরে যে সব ব্যাপার ঘটল সে সব কথা উনি কাউকে বলবেন না।'

" 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে এলিস ?' জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে কর্নেল বললে। 'তুমিই আমাদের ডোবাবে দেখছি। ও সব জেনে গেছে। আমাকে ছেড়ে দাও বলছি।'

"ভদ্রমহিলাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে কর্নেল লোকটা জানলার দিকে ছুটে এল। কর্নেলকে তেড়ে আসতে দেখে আমি কার্নিস থেকে সরে গিয়ে ঝুলে পড়লুম। জানলার ফ্রেমটা তখনও হাত দিয়ে ধরে ছিলুম। হঠাৎ আমার হাতে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগল। দারুণ যন্ত্রণায় হাত সরিয়ে নিতেই আমি ঝপ করে নীচে পড়ে গেলুম।

"নীচে পড়ে গিয়ে আমার খুবই লাগল। তবে ভাগ্য ভাল বলতে হবে, হাত-পা ভাঙেনি। তাই জোর করে নিজেকে সামলে নিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়তে লাগলুম। কেননা, এ খেয়াল ছিল যে, আমি বিপদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। ছুটতে ছুটতে মনে হল শরীরটা বেশ ঝিমঝিম করছে। হঠাৎ শরীরটা কেমন দুর্বল লাগতে লাগল। হাতটা দপদপ করছিল। কষ্টও হচ্ছিল খুব। হাতটার দিকে তাকাতেই দেখলুম আমার বুড়ো আঙুলটা একদম উড়ে গেছে আর কাটা জায়গাটা দিয়ে ভলভল করে রক্ত পড়ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কাটা জায়গাটা বাঁধতে গেলুম। আর তখনই মাথাটা কেমন করে উঠল। আমি একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে গেলুম।

"কতক্ষণ যে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলুম বলতে পারি না। তবে যে বেশ খানিকক্ষণ জ্ঞানহীন ছিলুম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যখন জ্ঞান হল দেখলুম চাঁদ ডুবে গেছে আর চারদিকে ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে। আমার জামা-কাপড় ভিজে শপশপ করছে। সারা রাত শিশির পড়েছে আমার গায়ে। কোটের হাতায় রক্ত লেগে রয়েছে। হাতটা তখনও দপদপ করছে। আমার প্রথম চিন্তা হল কী করে ওখান থেকে পালানো যায়। মনে হল, আমার শত্রুরা কাছাকাছি থাকতে পারে। এখানে বসে থাকলে তাদের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারি। চারদিকে তাকাতে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম। আমার চারদিকে সেই বাড়িটা বা বাগানটা দেখতে পেলুম না ! আমি বড় রাস্তার ধারে একটা ঝোপের কোণে পড়েছিলুম। দেখলুম একটু দূরে একটা একতলা বাড়ি। রাস্তা দিয়ে সেই বাড়িটার দিকে গেলুম। বাড়িটার কাছে এসে দেখি সেটা রেলস্টেশন। গতকাল রাত্রে এই স্টেশনে আমি নেমেছিলুম। আমার বুড়ো আঙুলটা যদি কাটা না পড়ত তাহলে গোটা ব্যাপারটা একটা

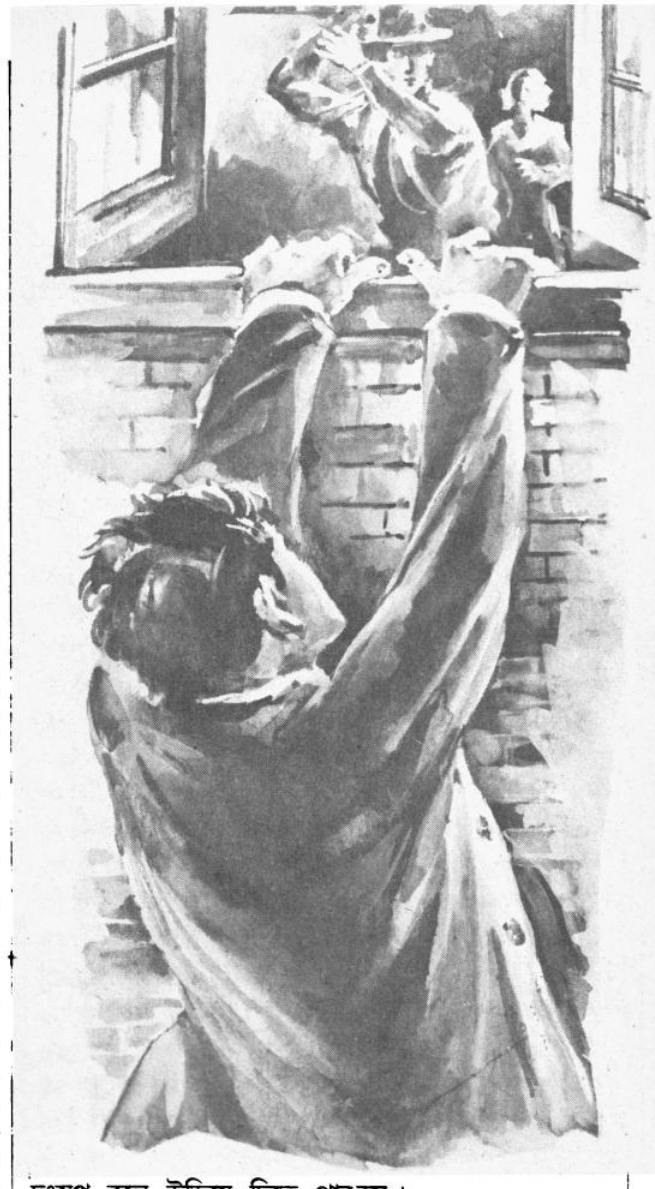

দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারতুম।

"কেমন একটা ঘোরের মধ্যে আমি স্টেশনে গেলুম। লণ্ডন ফেরার ট্রেনের খবর নিলুম। জানলুম আধঘণ্টার মধ্যে রেডিং থেকে একটা ট্রেন আসছে। কাল রাত্তিরে যখন স্টেশনে নেমেছিলুম তখন যে লোকটিকে ডিউটিতে দেখেছিলুম এখনও তারই ডিউটি চলছে। আমি তাকে কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম যে, কর্নেল লাইসেণ্ডার স্টার্ক বলে কাউকে সে চেনে কি না। সে ওই নামের কাউকে চেনে না। তাকে জিজ্ঞেস করলুম গতকাল আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে গাঁড়ি এসেছিল সেটা সে দেখেছে কি না। না, সে দেখেনি। তার কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলুম যে, থানা স্টেশন থেকে পাক্কা তিন মাইল দূর। তখন আমার শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে তিন মাইল পথ হাঁটা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক করলুম, লণ্ডনে ফিরে গিয়ে পুলিশকে সব কথা জানাব। ছ'টার একটু পরেই আমি লণ্ডনে পৌঁছে গেলুম। লণ্ডনে পা দিয়েই আমি প্রথমে গেলুম ডাক্তারের কাছে। সেখানে কাটা জায়গাটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ডাক্তারবাবুর দয়ায় এলুম আপনার কাছে। এই রহস্যের তদন্তের ভার আপনাকে দিলুম। আপনি যা বলবেন তাই করব।"

এই আশ্চর্য ঘটনা শুনে আমরা বেশ খানিকক্ষণ কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে রইলুম। তারপর শার্লক হোম্‌স উঠে গিয়ে একটা বড় আকারের বই শেলফ থেকে নামিয়ে আনলে। আমি জানি যে এই রকম বাঁধানো খাতায় সে নানা রকমের কাগজ থেকে কাটিং সেঁটে রাখে।

হোম্‌স হেদারলিকে বললে, "আপনাকে একটা বিজ্ঞাপন পড়ে শোনাই। বছরখানেক আগে সব খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল। শুনুন। হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জেরেমিয়া হেলিঙের (বয়স ২৬) সন্ধান গত ৯ তারিখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রি দশটার সময় বাসা থেকে বেরিয়েছেন। তারপর থেকে তাঁকে আর দেখা যায়নি। তাঁর পরনে এই ধরনের জামা-কাপড়....ইত্যাদি ইত্যাদি। হুঁ, এইটে হল শেষ যেবার কর্নেল হাইড্রলিক প্রেশার সারিয়েছেন সেবারের ব্যাপার।"

হেদারলি বলে উঠল, "উফ্, কী সাংঘাতিক কাণ্ড। এতক্ষণে সেই ভদ্রমহিলার কথার মানেটা বোঝা গেল।"

"ঠিক ধরেছেন। কর্নেল একটি জঘন্য ক্রিমিন্যাল। আগেকার দিনের জলদস্যুরা যেমন জাহাজ লুঠপাট করেই ক্ষান্ত হত না,জাহাজের সবাইকে মেরে ফেলত, কর্নেলও সেই জাতের। এর খপ্পরে যেই পড়বে তাকেই খতম করে দেবে। যাই হোক, এখন প্রতিটি সেকেণ্ড আমার কাছে দামি। যদি আপনি 'ফিট' মনে করেন তো আমরা এক্ষুনি কাজ শুরু করে দিই। আমাদের যেতে হবে এফোর্ড। কিন্তু তার আগে অবশ্য আমাদের যেতে হবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে।"

ঘণ্টা-তিনেক পরে আমরা রেডিং থেকে বার্কশায়ের সেই অজ পাঁড়াগায়ের দিকে যাবার জন্যে ট্রেন ধরলুম। আমরা বলতে শার্লক হোম্‌স, মিঃ হেদারলি, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট, একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবল আর আমি। ব্র্যাডস্ট্রিট তার দু-হাঁটুর ওপরে ওই অঞ্চলের একটা মিলিটারিদের ব্যবহারের ম্যাপ বিছিয়ে এফোর্ডকে কেন্দ্র করে কম্পাস দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকতে ব্যস্ত ছিল।

"ব্যস হয়ে গেল। এই গোল দাগের মধ্যে এফোর্ডের দশ মাইলের মধ্যে যা-কিছু তা সবই আছে। যে জায়গাটা আমরা খুঁজছি সেটা মনে হয় এই দাগের কাছাকাছি কোথাও হবে। মিঃ হেদারলি, আপনার ধারণা জায়গাটা এফোর্ড থেকে মাইল-দশেক দূরে হবে?" ব্র্যাডস্ট্রিট বললে।

"হ্যাঁ, তা হবে। গাড়িতে করে যেতেই আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা লেগেছিল।"

"আপনি বলছেন যে আপনি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তখন তারা আপনাকে তুলে নিয়ে এসেছিল।"

"নিশ্চয়ই তারা আমাকে তুলে এনেছিল। তা ছাড়া সেই তন্দ্রার ঘোরে আমার কেমন মনে হচ্ছিল যে আমাকে যেন কারা কোথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললুম, "কিন্তু আমার কাছে যেটা অদ্ভুত ঠেকছে সেটা হল যে বাগানের ভেতরে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েও ওরা আপনাকে না মেরে ছেড়ে দিল কেন? তা হলে কি সেই ভদ্রমহিলার কাকুতিতে গুণ্ডাগুলোর মনে দয়া হয়েছিল?"

হেদারলি বললে, "না, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। মানুষের চোখ-মুখের ভাব যে অত নিষ্ঠুর হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না। ওরকম মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি।"

হেদারলি চুপ করতেই ব্র্যাডস্ট্রিট বললে, "যাক গে, আর একটু পরেই সব ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাবে। এখন এই যে বৃত্তটা টেনেছি এর মধ্যে ঠিক কোথায় যে ওদের সন্ধান পাব সে কথাটা জানতে পারলে ভাল হত।"

প্রায় ফিসফিস করে হোম্‌স বললে, "মনে হচ্ছে জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারি।"

ব্র্যাডস্ট্রিট বললে, "তাই নাকি? আপনি এরই মধ্যে জেনে গেছেন কোথায় গেলে ওদের হদিস পাওয়া যাবে। আচ্ছা দেখা যাক কার সঙ্গে আপনার মতের মিল হয়। আমি বলছি আমাদের দক্ষিণ দিকে যেতে হবে। মনে হচ্ছে ওই দিকে লোকজনের বিশেষ বসবাস নেই।"

হেদারলি বললে, "আমার মনে হয় আমাদের পুব দিকে যেতে হবে।"

সাদা পোশাকের পুলিশটি বললে, "আমার মত হচ্ছে পশ্চিম দিকে যাওয়াই ভাল। ওদিকে কয়েকটা গ্রামের মতো রয়েছে।"

আমি বললুম, "উত্তর দিকে গেলে ওদের ধরতে পারা যাবে। ওদিকে পাহাড়-টাহাড় নেই। হেদারলির কথা থেকে জানতে পেরেছি যে, ওদের কোনও উঁচু-নিচু পথে যেতে হয়নি।"

ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট হাসতে-হাসতে বললে, "কারুর সঙ্গে তো কারুর মতের মিল হল না। দেখছি আমরা বৃত্তটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছি। মিঃ হোম্‌স এখন কার দিকে ভোট দিচ্ছেন?"

"আপনারা সবাই ভুল করেছেন।"

"তা কী করে সম্ভব। আমরা সকলেই কী করে ভুল করতে পারি।"

"হ্যাঁ, আপনারা সবাই ভুল করেছেন। জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন।" হোম্‌স সেই গোল দাগের ঠিক মাঝখানের কেন্দ্রবিন্দুতে তার আঙুল ঠেকালে। "এইখানে আমরা ওদের খোঁজ পাব।"

"কিন্তু আমরা যে দশ-বারো মাইল রাস্তা গেলুম সেটা কী ব্যাপার হল?" বিস্মিত হয়ে হেদারলি প্রশ্ন করলে।

"খুব সোজা। আপনারা যতটা রাস্তা গিয়েছিলেন ততটা রাস্তাই আবার ফিরে এসেছেন। আপনি বলেছেন যে যখন আপনি গাড়িতে উঠলেন তখন ঘোড়াটা বেশ টগবগ করছিল। আপনি বলুন তো ওই মেঠো পথে দশ-বারো মাইল রাস্তা গাড়ি টেনে আনলে ঘোড়াটা অত তাজা থাকত কি?"

হোম্‌সের কথা শুনে ব্র্যাডস্ট্রিট বললে, "হ্যাঁ, এটা অবশ্য খুবই সাধারণ চাল বটে। তবে দলটা যে বেশ সাংঘাতিক সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।"

"সে কথা হাজারবার সত্যি। এরা জাল টাকার ফলাও ব্যবসা চালাচ্ছে। আর ওই মেশিনটা দিয়ে কয়েন তৈরি করতে যে ধাতব পদার্থ লাগে তাই বানাত। জানেন বোধহয় এখন রুপো ব্যবহার করা হয় না।"

"আপনার অনুমান খাঁটি, মিঃ হোম্‌স। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে জাল টাকা-পয়সার খবর পাচ্ছি। এরা প্রচুর জাল খুচরো বাজারে ছেড়েছে। আমরা অনুসন্ধান করে জানতে

পেরেছি যে, রেডিংয়ের কাছাকাছিই এদের ঘাঁটি। তবে বহু চেষ্টা করেও এদের আসল ঠিকানাটা যোগাড় করতে পারিনি। এরা যেমন ধূর্ত আর তেমনি হুঁশিয়ার। এদের টিকির সন্ধান পাওয়াই অসম্ভব। যাক, আজ বরাতজোরে সেই অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। এবার আর বাছাধনদের রেহাই নেই।"

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রিট এ-খেপেও ওদের কব্জা করতে পারলেন না। এফোর্ড স্টেশনে পা দিতেই আমরা দেখলুম যে কালো পুরু ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাতে-পাকাতে ওপরে উঠছে।

ব্র্যাডস্ট্রিট বললে, "কোনও বাড়িতে আগুন লেগেছে?"

স্টেশনমাস্টার বললেন, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।"

"বাড়িটা কার?"

"ডাক্তার বেচারের।"

হঠাৎ হেদারলি বললে, "ডাক্তার বেচার কি জার্মান? তিনি কি খুব রোগা? তাঁর নাক কি খুব খাড়া?"

হেদারলির কথা শুনে স্টেশনমাস্টার হেসে উঠলেন। "না আপনি ভুল করছেন। ডাক্তার বেচার খাঁটি ইংরেজ। আর তাঁর চেহারাও বেশ শাঁসেজলে। তবে লোকে বলে তাঁর বাড়িতে তাঁরই এক রুগি থাকে। সে নাকি বিদেশী, আর তার শরীরও ভাল নয়।"

স্টেশনমাস্টারকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে যেদিকে আগুন লেগেছিল আমরা সেই দিকে ছুটলুম। রাস্তাটা একটা টিলার ওপরে উঠে গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়ে দেখলুম একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে আগুন লেগেছে। বাড়িটার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এখনও আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। সামনের বাগানে তিন-তিনটি বড়-বড় দমকল আগুন নেভাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

হেদারলি উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। "এই তো সেই বাড়ি। এই যে সেই নুড়ি-ফেলা রাস্তা। আর ওই যে ঝোপ দেখছেন ওইখানেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম।"

হোম্‌স বললে, "শেষ পর্যন্ত অবশ্য আপনি ওদের ওপর শোধ নিতে পেরেছেন। হাইড্রলিক প্রেশারে আপনার লণ্ঠনটি

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে
শার্লক হোমসের
নতুন গল্প : **মণিমুকুট**

যায় ভেঙে। আর তার থেকেই কাঠের দেওয়ালে আগুন ধরে যায়। আর তখন আপনার শত্রুরা আপনাকে ধাওয়া করতেই এত ব্যস্ত ছিল যে, আগুন লাগার ব্যাপারটা তাদের নজর এড়িয়ে যায়। যাক্। এখনও এই লোকজনের ভিড়ের মধ্যে ভাল করে নজর করে দেখুন তো যাদের সন্ধান করতে আমরা এখানে এসেছি তাদের কাউকে দেখতে পান কি না। অবশ্য আমার মনে হচ্ছে তারা অনেকক্ষণ আগেই এখান থেকে সরে পড়েছে।"

হোম্‌সের কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল। আজ পর্যন্ত সেই দু'জন লোকের বা সেই ভদ্রমহিলার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। যেটুকু খবর পাওয়া গিয়েছিল তা হল যে সেইদিনই ভোরবেলায় একজন লোক একটা বিরাট-বিরাট বাক্স বোঝাই গাড়িতে চেপে কয়েকজন লোককে রেডিংয়ের দিকে যেতে দেখে। ব্যস, সেই শেষ। তারপর বহু চেষ্টা করেও হোম্‌স

তাদের সন্ধান করতে পারলে না।

সন্ধে-নাগাদ দমকলের লোকেরা আগুন নিভিয়ে ফেললে। বাড়ির একটা জানলার ফ্রেমে একটা কাটা বুড়ো আঙুল দেখে দমকলের লোকেরা তো রীতিমত ঘাবড়ে গেল। বাড়িটার ছাদ ধসে পড়ার জন্যে যে যন্ত্রটাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেটা একদম টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। পাওয়া গেল শুধু সিলিণ্ডার আর লোহার নলের দোমড়ানো কিছু টুকরো আর বাড়ির একটা আউটহাউসে প্রচুর লোহা আর নিকেল। কিন্তু একটাও জাল পয়সা পাওয়া গেল না। বোধহয় সেগুলো ওই গাড়িতে বিরাট-বিরাট বাক্সে পুরে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিল ওরা। কিন্তু কীভাবে হেদারলি বাগান থেকে রাস্তার ঝোপে গিয়েছিল সেটা অবশ্য জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। এক জায়গায় মাটিটা একটু নরম ছিল। সেখানে দু' জোড়া পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। এক জোড়া ছাপ বেশ বড় মাপের আর এক জোড়া ছাপ খুবই ছোট। বোঝা গেল সেই ইংরেজটি আর ভদ্রমহিলাই হেদারলিকে বাগান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

হেদারলি কাতর স্বরে বললে, "আমার সবটাই লোকসান। কাজ করে পয়সাও পেলুম না আবার বুড়ো আঙুলটাও গেল।"

হোম্‌স হেসে বললে, "কিন্তু কত বড় অভিজ্ঞতা হল বলুন তো? এই অভিজ্ঞতার জন্যে বাকি জীবন আপনি দারুণ রকম উপভোগ করতে পারেন।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

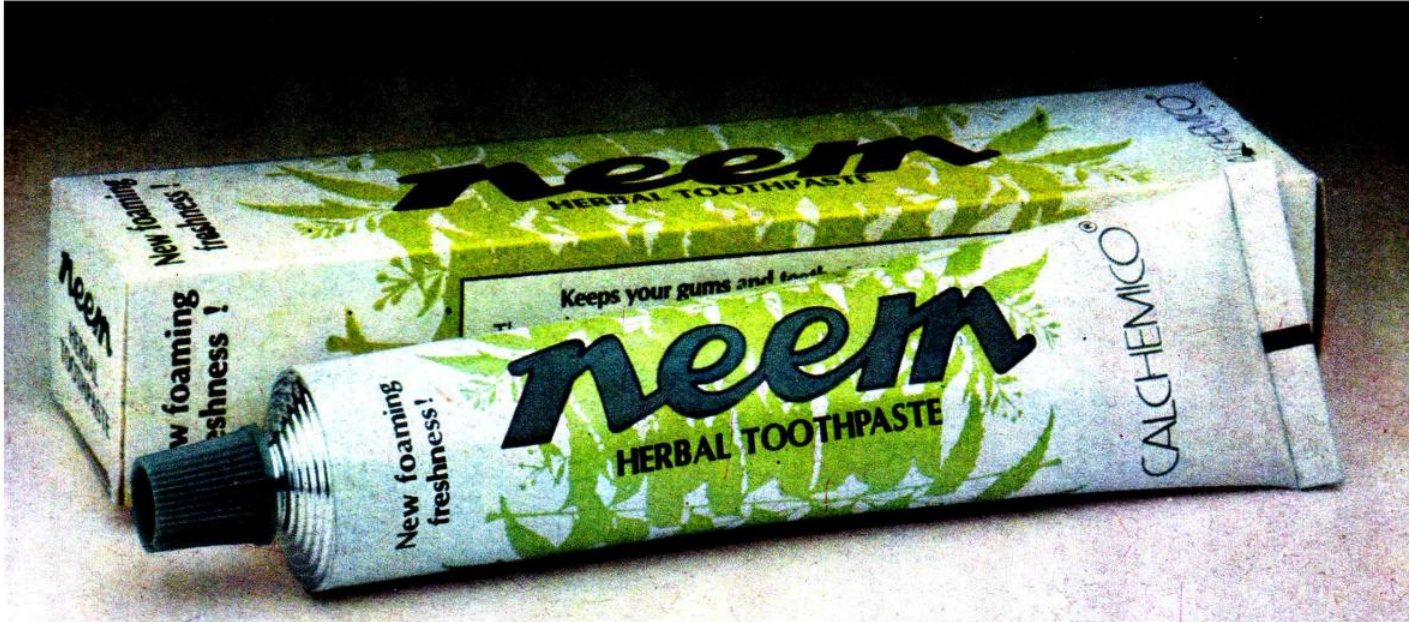

নিম টুথপেস্ট

শক্ত দাঁত ও সুস্থসবল মাড়ির জন্যে একটি প্রাকৃতিক উপায়

শত শত বৎসর ধরে নিমের দাঁতনই ছিল দাঁতের যত্নের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক উপায় । এতে দাঁত শক্ত হত ও মাড়ি থাকত সুস্থসবল ।

৬২ বছর আগে, ক্যালকাটা কেমিক্যাল নিমের প্রাকৃতিক গুণটুকু নিয়ে তৈরি করেছে একটি টুথপেস্ট···নিম—ভারতের প্রথম ভেষজ গুণেভরা টুথপেস্ট ।

আর এখন, নতুন নিম টুথপেস্টে আছে বাড়তি ফেনা···এর ফলে নিমের ভেষজ ও তেলের জীবাণুনাশী শক্তি আরো সক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে । তাছাড়া এতে একটি নতুন সুবাস থাকার ফলে মুখে একটি তরতাজা অপূর্ব স্বাদ অনুভব করা যায় ।

নিম

পৃথিবীর প্রথম ভেষজ টুথপেস্ট । ভারতে এর জন্ম ৬০ বছর আগে

9290A/14BEN

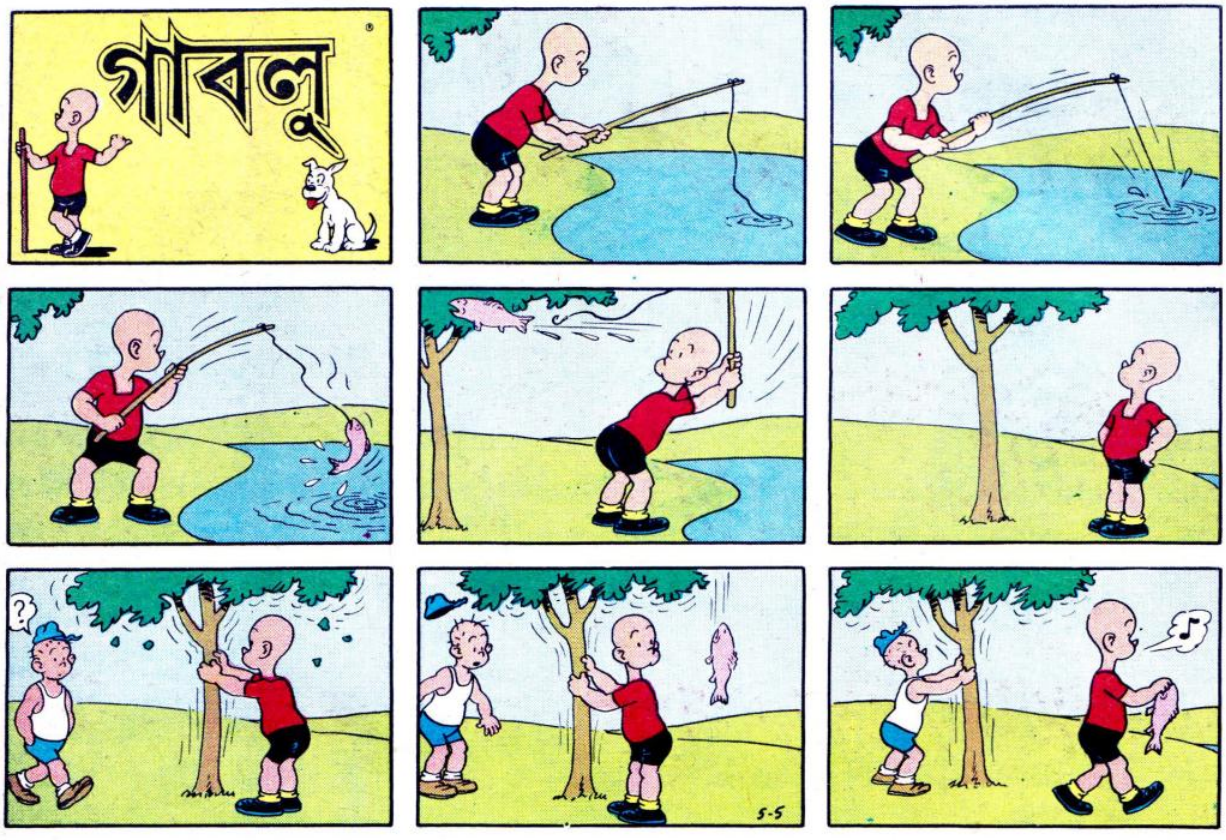
গাবলু
?
5-5

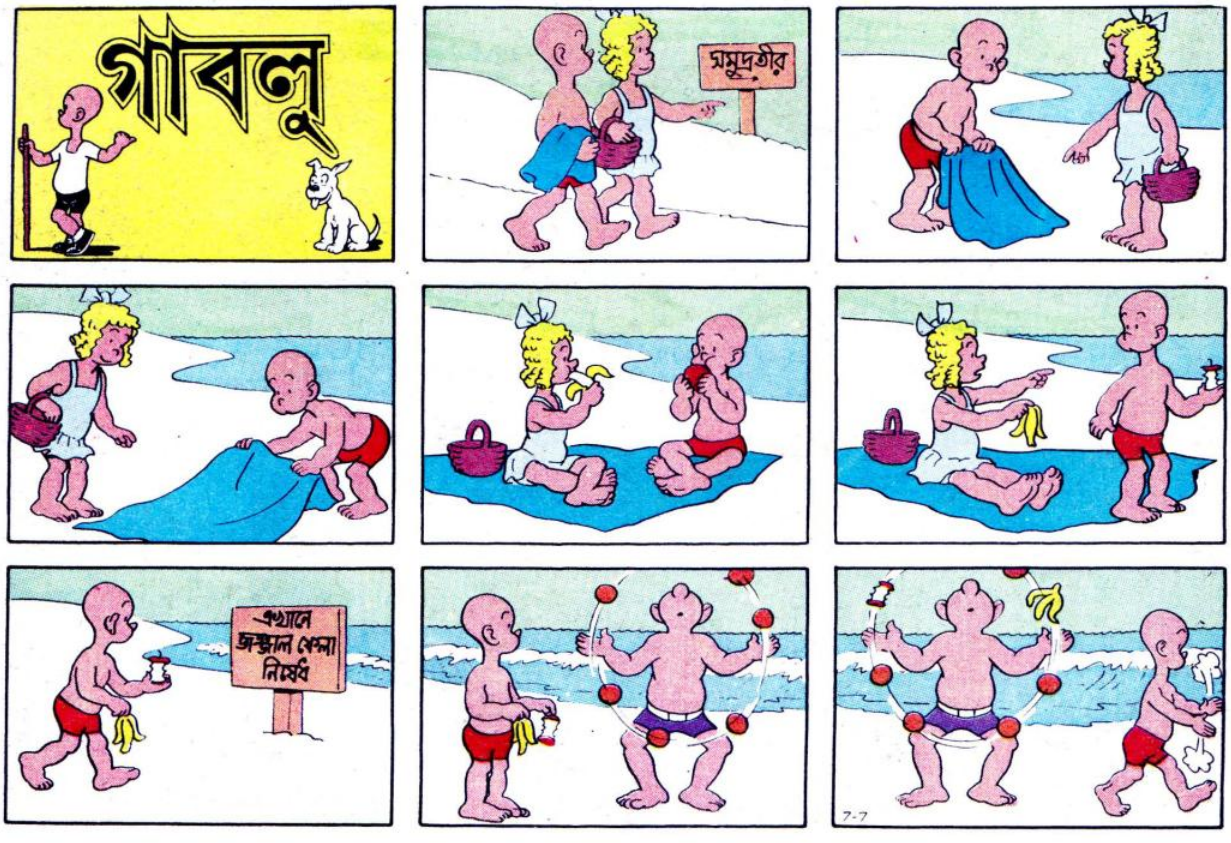
গাবলু
সমুদ্রতীর
এখানে জঞ্জাল ফেলা নিষেধ
7-7

ভারতের হার, জয় বিজয়ের

অশোক রায়

বাঙ্গালোরে ভারত-সুইডেন ডেভিস কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের শুরু থেকেই আমরা জানতাম ভারতের চেয়ে সুইডেন অনেক বেশি শক্তি ধরে। বিশ্বের তিন এবং আট নম্বর খেলোয়াড় ম্যাট্স উইল্যাণ্ডার এবং অ্যাণ্ডার্স ইয়ারিড রয়েছেন সুইডেন-দলে। উইল্যাণ্ডার অল্প ক'দিন আগেই জিতেছেন ফরাসি খেতাব। ইয়ারিড উইম্বলডন সেমি ফাইনালে হেরেছেন বরিস বেকারের কাছে। এমন দুই বিখ্যাত এবং শক্তিমান খেলোয়াড় ছাড়াও দলে ছিলেন স্টেফান এডবার্গের মতো নামী খেলোয়াড়। তুলনায় ভারত ছিল অনেকটাই কমজোরি। ভারতের ভরসা বলতে ছিল দুটি জিনিস। এক, বয়স্ক বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ এবং রমেশ কৃষ্ণনকে 'জায়েন্ট কিলার'-এর ভূমিকায় হঠাৎ ফুঁসে উঠতে দেখা। দুই, ঘাস। 'ঘাস' ব্যাপারটা কী বোধহয় ঠিক বুঝতে পারলে না ? বাঙ্গালোরের কোর্ট তৈরি করা হয়েছিল ঘাসের। আমাদের জানা ছিল, সুইডেনের খেলোয়াড়রা অন্য যে-কোনও সারফেসে দুর্দান্ত টেনিস খেললেও ঘাসের কোর্টে ওঁরা খুব একটা সুবিধে করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না, বিশ্ব-টেনিসে যাঁরা সেরা পর্যায়ের খেলোয়াড় কোর্টের জুজু দেখিয়ে তাঁদের রোখা কঠিন।

বিজয় চেয়েছিলেন উদ্বোধনী ম্যাচটা খেলতে। তাঁর সঙ্গে খেলা পড়ল ইয়ারিডের। ৩ ঘন্টা ১০ মিনিট ধরে ৩২ বছর বয়সী বিজয় তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রাণপণ লড়াই করেও তারুণ্যের দাপটের কাছে হার মানলেন। ইয়ারিড জিতলেন ৩-৬, ৭-৫, ২-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে। বিজয় হারলেও দর্শকদের মনে তাঁর সংগ্রামী চরিত্রের ছাপ আঁকা রইল।

দ্বিতীয় ম্যাচে রমেশ এবং উইল্যাণ্ডারের খেলা অবশ্য জমেনি। বিপক্ষের বিরাট নামডাকের চাপে রমেশ যেন কিছুটা কুঁকড়ে ছিলেন। রমেশ স্ট্রেট সেটে হেরে গেলেন ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ গেমে।

প্রথম দিনেই ৩-২ মার্জিনে পেছিয়ে পড়ার পরেও ডাবলস ম্যাচে হাল ছাড়েননি বিজয়-আনন্দ জুড়ি। ইয়ারিড-এডবার্গ জুটিকে প্রচণ্ড চাপের মুখে ঠেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জুড়ি পরাজিত হয় ১৯-২১, ৬-২, ৩-৬, ৪-৬ গেমে। প্রথম সেটের ফলের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কীভাবে সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন বিজয় ও আনন্দ।

০-৩ মার্জিনে পিছিয়ে পড়ায় ফলাফল আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। তবু দর্শকরা অপেক্ষা করেছিলেন বিজয় ও ম্যাট্স উইল্যাণ্ডারের খেলার জন্য। সকলেই চাইছিলেন হার তো হয়েছেই, বিজয় শুধু একটিবার তাঁর অতীতে ফিরে যান। দর্শকদের নিরাশ হতে হয়নি। ৩২ বছরের বিজয় ২০ বছর বয়সী পৃথিবীর সেরা তিন নম্বরের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠলেন। অসাধারণ টেনিস উপহার দিয়ে বিজয় মন্ত্রমুগ্ধ করলেন বাঙ্গালোরের দর্শকদের। বিশ্বের তিন নম্বর খেলোয়াড় উইল্যাণ্ডার তলিয়ে গেলেন বিজয়ের চাপের মুখে। ম্যাচ জিতলেন বিজয় ৮-৬, ৯-৭ গেমে। এবং খেলালেন সম্ভবত টেনিস-জীবনের সর্বোত্তম ম্যাচটি। পরের সিঙ্গলসে রমেশ হেরে গেলেন ইয়ারিডের কাছে ৩-৬, ৬-৪, ১-৬ গেমে।

ডেভিস কাপে ভারত হেরে গেল ৪-১ ফলাফলে। যদিও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশের বিপক্ষে এ-হার মোটেই অগৌরবের নয়।

বিজয় অমৃতরাজ

ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অস্ট্রেলিয়াকে বাঁচাল বর্ডারের ব্যাট

রাজা গুপ্ত

আকাশে ছিল মেঘের আনাগোনা। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টে টস জিতেই ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন ডেভিড গাওয়ারকে ফিল্ডিং নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি। প্রথম দিনেই অস্ট্রেলিয়া মুখ থুবড়ে পড়ে ২৫৭ রানে। ব্যাটিং অর্ডারে প্রমোশন পেয়ে ডেভিড বুন করেন ৬১ রান। বথাম এবং এমবুরি পান চারটি করে উইকেট।

ইংল্যান্ড প্রথম থেকেই সতর্কভাবে ইনিংস গড়ার কাজ শুরু করে। রবিনসন (১০) অল্পে বিদায় নিলেও গ্রাহাম গুচ এবং অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার উইকেটে শিকড় নামিয়ে দেন। পিটিয়ে খেলার ব্যাপারে গুচের রীতিমত সুনাম আছে। প্রথম দিকে তিনিও ছিলেন সংযত। পরের দিকে

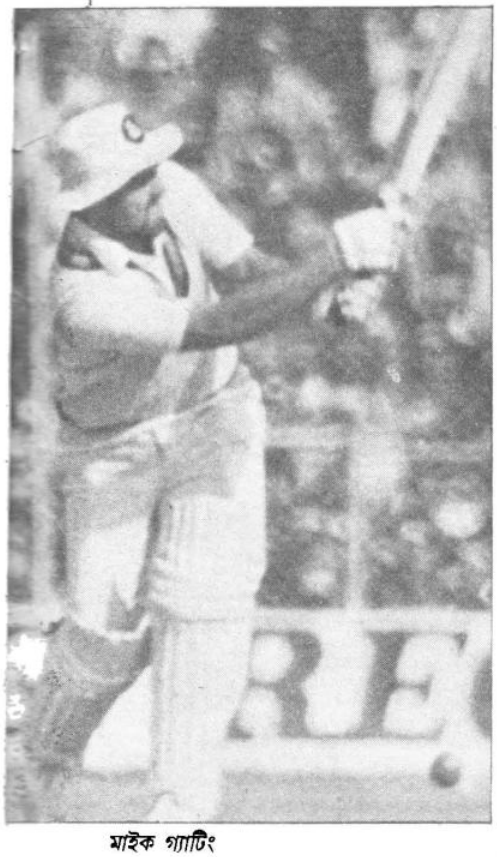

মাইক গ্যাটিং

ডেভিড গাওয়ার

অবশ্য ঝলসে ওঠে তাঁর ব্যাট। দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন রকেটের গতিতে। নড়ার আগেই প্রথমটা সোজা গিয়ে লাগে আম্পায়ার ডিকি বার্ডের পায়ে। চিকিৎসকের সহায়তা নিয়ে পায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে মাঠে নামার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার একটা স্ট্রেট ড্রাইভ গুচের ব্যাট থেকে ছিটকে আসে ডিকি বার্ডের পা লক্ষ করে। সতর্ক থাকায় শটের ছোবল কোনওক্রমে এড়িয়ে যান বার্ড। হিস হিস শব্দ তুলে বল বিদ্যুতের গতি নিয়ে বাউণ্ডারিতে আছড়ে পড়ে ঝনঝন করে। গাওয়ারও প্রথম দিকে বিব্রত বোধ করছিলেন ম্যাক্‌ডারমটের বলে। এই সিরিজে পেসার ম্যাক্‌ডারমটের বলে গাওয়ার উইকেটের পেছনে আউট হয়েছেন চার বার। এবারও শেষ পর্যন্ত তাঁর বলেই গাওয়ারের ইনিংস (৪৭) দীপটি নিবল। আউট হবার আগে অবশ্য গাওয়ার টেস্ট ক্রিকেটে নিজস্ব পাঁচ হাজার রান পূর্ণ করেন। তবে গাওয়ার যেখানে ছাড়লেন সেখান থেকে শুরু করেন মাইক গ্যাটিং। শুধু নিজস্ব সেঞ্চুরিই নয়, ইংল্যান্ডকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিলেন তিনি। মাইক গ্যাটিংয়ের সেঞ্চুরি প্রসঙ্গে ডেভিড গাওয়ার বলেছেন, "গ্যাটিং অনেকদিন বড় ইনিংস পাচ্ছিল না। এই সেঞ্চুরিতে আমি খুব খুশি।" নিজের সেঞ্চুরি সম্বন্ধে গ্যাটিং বলেছেন, "গত বছর ভারত সফরেই আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। কী করে একটানা চার ঘণ্টা ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সেটা আমি

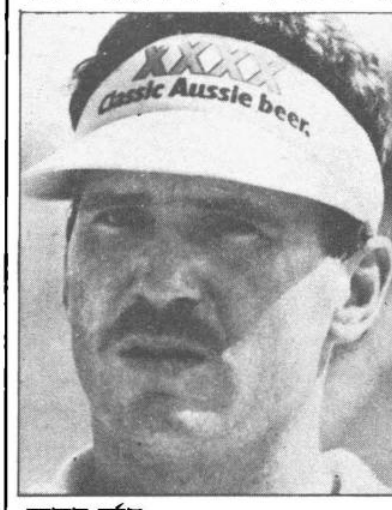

অ্যালান বর্ডার

ভারতের মাটিতেই শিখেছিলাম।"

ইংল্যাণ্ড শেষপর্যন্ত ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ৯ উইকেটে ৪৮২ রানে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ক্রেগ ম্যাক্‌ডারমট একাই আট ইংরেজ-বধের কৃতিত্ব দেখান।

২২৫ রানে পিছিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দফায় শুরু করল টলমল করতে-করতে। আলো কম থাকায় শেষ দিনে লাঞ্চের আগে মাত্র তিন ওভারের বেশি হাত ঘোরাবার সুযোগ পাননি। তবু চা-বিরতিতে পাঁচ উইকেট ফেলে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার শিবিরে আতঙ্ক তৈরি করেন ইংরেজ বোলাররা। কিন্তু অস্ট্রেলীয় ইনিংস পাহারা দিচ্ছিলেন অধিনায়ক বর্ডার স্বয়ং। ৩৪৬ মিনিট ধরে ইংরেজ বোলারদের পেস-স্পিনের যাবতীয় ছোবল ব্যাটে সামলে বর্ডার ১৪৬ রানে অপরাজিত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়াকে। টেস্ট ক্রিকেটে এটি বর্ডারের চতুর্দশ শতরান।

ম্যাচ ড্র হল। কিন্তু দুই শিবিরের ভাবনাতেই ঢুকে পড়লেন অ্যালান বর্ডার। ইংল্যাণ্ড ভাবল, তাদের নিশ্চিত জয়ের পথে বর্ডারই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। আর সব অস্ট্রেলিয়ানরা একযোগে ভাবতে বসলেন—বর্ডার যদি দুর্ধর্ষ ফর্মে না থাকতেন, কী হত ?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভক্ত শুধু বড়রা নয়, ছোটরাও

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে বড়দেরই প্রিয় লেখক তা নয়, ছোটরাও তাঁর কিশোরসাহিত্যের দারুণ ভক্ত। হবে নাই বা কেন। যেমন সুন্দর গল্প তেমনই সুন্দর ভাষা আর বর্ণনাভঙ্গি। শরদিন্দুর যাবতীয় ছোটদের লেখা নিয়ে বেরিয়েছে শরদিন্দু অমনিবাসের চতুর্থ খণ্ডটি। এই একটিমাত্র বইতেই সদাশিবের দারুণ সব কাহিনী, অজস্র গল্প আর আকর্ষণীয় অন্যান্য লেখা। আরেকটি বই হল, 'ভূমিকম্পের পটভূমি'। দুটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর এক অনবদ্য সংকলন এই বইটি। একটি কাহিনীতে একটি নির্জন দ্বীপ আর সেখানকার বাসিন্দা বলতে ছোট্ট একটি মেয়ে ও তার ক্যাঙারু-বন্ধুর গল্প, আরেকটিতে পাঁচশো বছর আগেকার এক যুবরাজ যুবরাণীর বহু জন্ম বাদে পুনর্মিলন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই

ভূমিকম্পের পটভূমি ৬·০০

শরদিন্দু অমনিবাস ৪র্থ খণ্ড ৩০·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও ছোটদের বই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বই নিয়ে এতকাল শুধু বড়রাই টানাটানি করেছেন, এখন তোমরাও করবে। তোমাদের জন্য দু-খানি আশ্চর্য বই লিখেছেন তিনি। 'রুকুসুকু' এবং 'কলকাতার নিশাচর।' শেষোক্ত বইতে দু-দুটো রহস্যোপন্যাস একসঙ্গে ছাপা হয়েছে। 'কলকাতার নিশাচর' ও 'ক্যালিপসো থ্রম্বোফব'। দুটো রহস্য-উপাখ্যানেরই গোয়েন্দা এক দাদু ও তাঁর কিশোর নাতি। হারানো এক কাবলি বেড়ালের খোঁজে বেরিয়ে অনেক কীর্তিকাণ্ডের নায়ককে ধরে ফেলার গল্প নিয়ে একটি, অন্যটিতে চশমা থেকে এক আন্তর্জাতিক অপরাধীকে খুঁজে বার-করা। দুটোই দারুণ রোমাঞ্চকর। শুধু রোমাঞ্চ কেন, মুচমুচে মজা আর ফুরফুরে হাসিও কম নেই। 'রুকুসুকু' আবার একেবারে অন্য স্বাদের। এ-বই পড়ে জীবনকে আরও ঘন ও নিবিড় করে চিনতে শিখবে তোমরা। নিজেদের অজান্তেই কখন আর কীভাবে যেন বড় হয়ে উঠবে। জানতে শিখবে, বড় হওয়া মানেই শুধু হারিয়ে যাওয়া নয়। বড় হতে হতে, বড় হতে হতে মৃত্যুর চেয়ে বড় হয়ে ওঠার নামই আসল জীবন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কিশোর-গ্রন্থ :

রুকুসুকু ১০·০০

কলকাতার নিশাচর ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

হাউজ দ্যাট

সুজয় সোম

সেবার কাউন্টি ক্রিকেটের খেলা হচ্ছিল লর্ডসে। মিডলসেক্স ও হ্যাম্পশায়ার দলের লড়াই। বল করছিলেন হ্যাম্পশায়ারের জন নিউম্যান। তাঁর একটা সোজা বল ব্যাটের মাঝখান দিয়ে মিড অনে ঠেললেন ব্যাটসম্যান। কাছে-পিঠে ফিল্ডার নেই, অন্য প্রান্তের ব্যাটসম্যান হেনরি এন্‌থোভেনকে রান নেবার ডাক দিলেন। বেগতিক দেখে নিউম্যানও যেই দৌড়তে গেলেন, এন্‌থোভেনের সঙ্গে কলিশন। এন্‌থোভেন পড়ে গেলেন মাটিতে। হুড়মুড় করে উঠে ক্রিজে ফিরে আসার আগেই উইকেট ভেঙে চুরমার।

"হাউজ দ্যাট ?"

খেলোয়াড়দের কোরাসে সায় দিলেন না আম্পায়ার বিল রিভস্।

"সে কী! এটা ক্লিন আউট।" নিউম্যান হৈহৈ করে উঠলেন।

একটু শুকনো হেসে আম্পায়ার বললেন, "সার্টেনলি নট। আপনার সঙ্গে ধাক্কা না লাগলে ব্যাটসম্যান আউট হতেন না।"

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব কমিটির কাছে আম্পায়ারের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন হ্যাম্পশায়ারের অধিনায়ক লর্ড টেনিসন। এক সপ্তাহ পরে জরুরি সভা বসল। কমিটির চেয়ারম্যান বিখ্যাত খেলোয়াড় লর্ড হক্ পুরো ঘটনাটা শুনলেন রিভস্ এবং দু-দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের কাছে।

রিভস্ আচমকা লর্ড হক্‌কে জিজ্ঞেস করে বসলেন, "আপনি আম্পায়ার থাকলে এই অবস্থায় কী করতেন, স্যার ?"

"সবুর করো, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে দাও। চট করে কী ডিসিশন নেব ?" হক্ বললেন।

রিভস্ মুচকি হাসলেন, "স্যার, সারা হপ্তা ধরে ভাবলেন, আজও অনেকক্ষণ কেটে গেল। এখন আবার সময় চাইছেন ? আমি সময় পেয়েছিলুম এক সেকেণ্ড।"

কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন লর্ড হক্। রিভস্‌কে

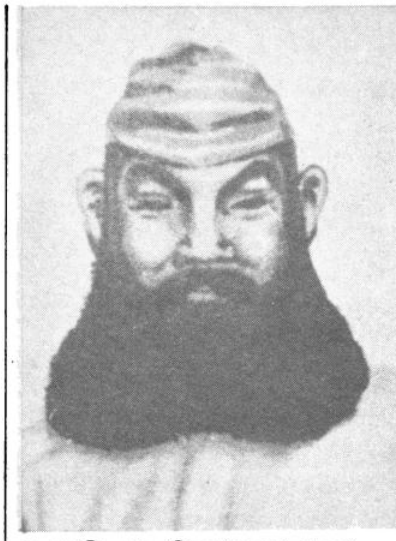

ডবলু· জি· গ্রেস (ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ)

বেকসুর খালাস করে দিলেন।

সাধারণত হাউজ দ্যাট-এর আবেদন অতদূর গড়ায় না। ঘটনার জের মাঠের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কোনও-কোনও ঘটনা অবিশ্যি এতটাই মজার, পাকাপাকি থেকে যায় ক্রিকেটের খোশ গল্পের ঝুলিতে। অনেক সময় খুঁটিনাটি বিবরণ ছাড়াই।

লেগ বিফোর উইকেট-এর অ্যাপিলে আম্পায়ার সাড়া না দিলে সবচেয়ে অখুশি হন বোলার। সেনট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লিগের এক খেলায় একজন স্লো বোলার বল করছিলেন। তাঁর একটা সোজা বল ব্যাটসম্যানের প্যাডে লাগল।

"হাউজ দ্যাট ?"

বোলারের চিৎকারে আম্পায়ার কান দিলেন না।

ওভার শেষ করেই বোলার চটা গলায় আম্পায়ারকে শুধোলেন, "বলটা সোজা ছিল তো ?"

"হ্যাঁ।"

"একটুও স্পিন করেনি ?"

"না।"

"ব্যাটস্‌ম্যানের ব্যাটেও লাগেনি ?"

"না।"

"তা হলে আউট দিলেন না কেন ?"

"বলটা বড্ড আস্তে ছিল। উইকেটে লাগলেও বেল পড়ত না!"

কখনও-কখনও দর্শকরাও চটে যান আম্পায়ারের ওপর। একবার যেমন ঘটল অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগে দুই ডাকসাইটে দলের খেলায়। ফিল্ডারদের পর-পর কয়েকটা হাউজ দ্যাট-এর আবেদন আম্পায়ার নাকচ করতেই, মাঠের এক দিকের দর্শকেরা বেজায় হট্টগোল শুরু করলেন। অভিযোগ, আম্পায়ার ন্যায্য আউট থেকে তাঁদের দলকে বঞ্চিত করেছেন।

হৈচৈ খানিক গড়াতে আম্পায়ার মাঠ থেকে বেরিয়ে সটান ওই দর্শকদের মধ্যে গিয়ে বসলেন।

"কী ব্যাপার, আপনি এখানে এলেন ?" দর্শকেরা অবাক!

"আউট হয়েছে কি না, এখান থেকেই বোধহয় ভাল বুঝতে পারব।"

এরকম ব্যক্তিত্ব আর পরিহাসবোধ থাকা দরকার আম্পায়ারদের। কিন্তু খেলোয়াড়দের হাউজ দ্যাট-এর শোরগোলে সাড়া দিয়ে যে-ব্যাটস্‌ম্যানকে বিদায় জানালেন আম্পায়ার, তাঁর নাম যদি হয় উইলিয়াম গিলবার্ট গ্রেস ?

এক প্রদর্শনী-ক্রিকেটের আসরে ব্যাট করতে নামলেন গ্রেসসায়েব। প্রথম বলটাই ব্যাটে-বলে হল না। প্যাডে লাগল।

বোলার এবং উইকেটকিপার পড়ি-মরি চেঁচিয়ে উঠলেন, "হাউজ দ্যাট ?"

আম্পায়ার আঙুল তুলে দিলেন।

আম্পায়ারের দিকে কয়েক পা এগিয়ে কটমটে চোখে গম্ভীর গলায় গ্রেসসায়েব বললেন, "ওহে, মাঠে সবাই আমার খেলা দেখতে এসেছে। তোমার আম্পায়ারিং দেখতে নয়।"

ক্রিজে ফিরে আবার স্টান্‌স নিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

ছাই নিয়ে লড়াই

সুব্রত সিংহ

এই মুহূর্তে টেস্ট ক্রিকেটের একমাত্র আসরটি বসেছে ক্রিকেটের মাতৃভূমি ইংল্যান্ডে। সেখানে চলেছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার 'অ্যাশেজ-সিরিজের' লড়াই। শুধু লড়াই বললে বোধহয় ভুল হবে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কেননা, এই দুটি দেশ যখনই মুখোমুখি হয়, তখন সেটা তাদের জাতীয় সম্মান রক্ষার লড়াই হয়ে দাঁড়ায়। এই মনোভাব গড়ে উঠেছে ১৮৮২ সালে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। তারই ফল এই অ্যাশেজ-সিরিজ।

যে ঘটনার কথা আমি এখানে তুলে ধরছি সেটি ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আগেই বলেছি ওই ঘটনাটি ১৮৮২ সালের। সেবার অস্ট্রেলীয়-ক্রিকেটদল মাত্র একটি টেস্ট খেলার জন্য ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিল। খেলা হয়েছিল ওভালে।

জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার ছিল মাত্র ৮৫ রানের। মাত্র ওই ক'টি তো রান! সুতরাং, জয় অনিবার্য। আনন্দে সারা মাঠে খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। ইংল্যান্ডের প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যানরা তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাঠে নামলেন।

অন্যদিকে পরাজয় সুনিশ্চিত। নতুন করে হারাবার কিছু নেই। সুতরাং, 'ডু অর ডাই'। অধিনায়কের এই নির্দেশ নিয়েই সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা।

যতই সময় এগোচ্ছিল, সারা মাঠে

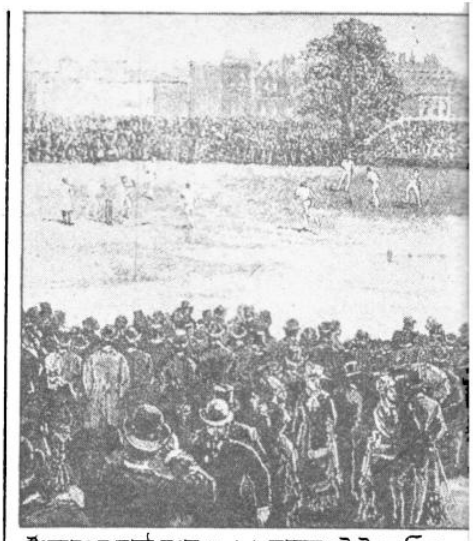

ইংল্যাণ্ডের মাঠে যখন ১৮৮২ সালের টেস্ট চলছিল

উত্তেজনাও বেড়ে চলেছিল। একের পর এক উইকেট পতনে ইংল্যান্ড-শিবিরে অন্ধকার নেমে এসেছিল। অন্যদিকে নিশ্চিত পরাজয়কে জয়ে পরিবর্তিত করায়, আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল অস্ট্রেলীয় শিবিরে। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭৭ রানেই নুয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ডের ইনিংস। অস্ট্রেলিয়া ওই টেস্টটি জিতে নিয়েছিল ৭ রানে।

অস্ট্রেলিয়ার ওই ঐতিহাসিক জয়ে যিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন, অস্ট্রেলিয়ার দৈত্যকায় বোলার এফ· আর স্পফোর্থ। তাঁর মারাত্মক বোলিংয়ের মোকাবিলা সেদিন ইংল্যান্ডের কোনও ব্যাটসম্যানই করতে পারেননি। ওই ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ছিল মাত্র ৯০ রানের বিনিময়ে (৪৬—৭ ও ৪৪—৭) ১৪টি উইকেট।

ইংল্যান্ডের কোনও ক্রিকেটপ্রেমীই দেশের মাটিতে সেই অভাবনীয় পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। সেদিনের ওই পরাজয়কে অনেকেই জাতীয় বিপর্যয়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সংবাদপত্রগুলিতেও প্রচণ্ড সমালোচিত হয়েছিলেন ইংল্যান্ড-ক্রিকেটাররা। স্পোর্টিং টাইমস্ লিখেছিলেন, "ওভালে ইংল্যান্ড-ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে। দেহাবশেষ দাহ করে সেই ছাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়।" এমনই আরও অনেক কটূক্তি করা হয়েছিল ইংল্যান্ড-ক্রিকেট সম্পর্কে।

ওই ঘটনার পরই দু'দেশের মধ্যে 'অ্যাশেজ সিরিজের' খেলা শুরু হয়েছিল।

১৮৮২ সালের টেস্টের পর স্পফোর্থকে একটি কার্টুনে দেখানো হয় দৈত্যরূপে

ওর দাঁতকে এখন থেকেই সুরক্ষিত করে নিন

এই ফ্লোরাইড সংরক্ষণ একে বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে করুন

দাঁতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে নিতে হ'লে, দন্তছিদ্রের সংরক্ষণ করুন আর, বিনাকা ফ্লোরাইড-এর ফ্লোরাইডই দেয় ঐ অপরিহার্য সংরক্ষণ। কারণ, মুখের ভেতরের ক্ষতিকর অ্যাসিড যখন দাঁতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন এই ফ্লোরাইড, দাঁতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে দন্তছিদ্র হওয়া রোধ করে—আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দন্তক্ষয় হওয়াও রোধ হয়।

তাই বিনাকা ফ্লোরাইড দিয়ে, দন্তছিদ্র হওয়া বন্ধ করুন, দন্তক্ষয় রোধ করুন।

দাঁতে নব জীবনের সাড়া

বিনাকা ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ভারতের সর্বপ্রথম ও প্রভাবশালী ফ্লোরাইড টুথপেস্ট

ULKA-HCG-BF-10-85-BENG

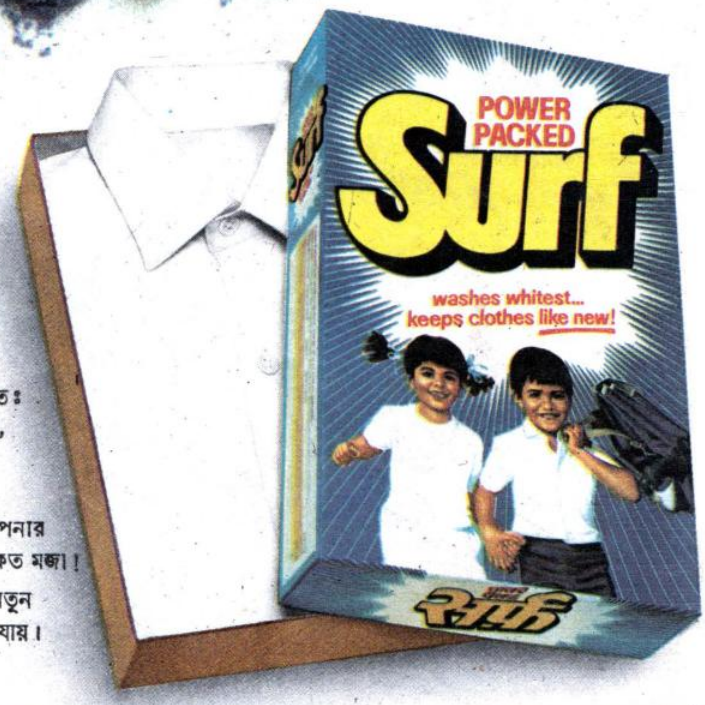

ANANDAMELA 4 SEPTEMBER, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

নতুন পাওয়ার প্যাকৃড সার্ফ।

আগের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ফর্মূলেশনে তৈরী, ফলে এর কণায় কণায় ঠাসা থাকে শক্তির ভাণ্ডার: কাপড়ের গভীর পর্য্যন্ত পৌঁছে সাফ করতে পারে! আপনার সমস্ত সাদা কাপড়কে রাখে সবচেয়ে সাদা, আর রঙীন কাপড়কে সবচেয়ে উজ্জ্বল।

অথচ কাপড় থাকে পুরোপুরি সুরক্ষিত, নতুনের মত: প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তকতকে তাজা, ঝকঝকে পরিষ্কার, ধবধবে সাদা...নতুনের মত!

ধোলাইয়ের পর ধোলাই!

নতুন অনুপম সুগন্ধঃ যা জড়িয়ে থাকবে আপনার জামাকাপড়ে: কত পরিষ্কার, কত তাজা, কাছে থেকেও কত মজা!

আকর্ষণীয় নতুন প্যাকঃ যা ভেতরের এই নতুন পাওয়ার প্যাকৃড ফর্মূলেশনের সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়।

আসুন! আজই নিন নতুন পাওয়ার প্যাকৃড সার্ফ!

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

LINTAS-SU-324-2619BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন